কন্যাসু

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

('বনফুল')

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই বৈশাখ,
১৮৮৪ শকাব্দ

টা. ২·৫০

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

উৎসর্গ

নব বৈবাহিক

শ্রীযুক্ত তুলসীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মান্যবরেষু—

মেয়ের বয়স যখন কুড়ি পেরিয়ে গেল তখন ব্রজেন্দ্রবাবু আর স্থির থাকতে পারলেন না। তাঁর স্ত্রী হরমোহিনী তাঁকে স্থির থাকতে দিলেন না। ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত লোক, একটি গেঞ্জির মিল আছে তাঁর। দেশের সবাই তাঁর নাম জানে। ছোট বড় নানা কাগজে তাঁর নাম বিজ্ঞাপিত হয়। লোকে জানে তিনি খুব ধনী লোক। কিন্তু ধনী বলে' যতটা তাঁর নাম-ডাক ব্যাঙ্কে তত টাকা তাঁর নেই। অধিকাংশ টাকাই ব্যবসাতে খাটছে। তবে অবশ্য টাকার অভাবেই যে তাঁর মেয়ের বিয়ে হচ্ছিল না তা নয়। কোথায় মনোমত সৎপাত্র আছে তা তিনি ঠিক খবর পাচ্ছিলেন না। মাঝে মাঝে পেলেও যোগাযোগ হচ্ছিল না ঠিক। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি লিখেছিলেন অনেকগুলো। কোনও ফল হয় নি। কয়েকখানা চিঠি লিখে তাঁর এই ধারণা হ'ল যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যে সব পাত্রের জন্য সাধারণতঃ পাত্রী খোঁজা হয় সে সব পাত্র ঠিক সুপাত্র নয়। কোনও না কোনও গলদ আছে তাদের মধ্যে। হয় বয়স বেশী, না হয় চেহারায় বা বংশে খুঁত আছে। অর্থাৎ নিজেদের পরিচিত গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁরা পাত্রী সংগ্রহ করতে না পেরে বিজ্ঞাপনের শরণাপন্ন হয়েছেন। বিজ্ঞাপন-দেনে-ওলাদের মধ্যে আর এক ধরনের লোকের সন্ধান পেয়েছিলেন ব্রজেনবাবু। এঁরা সাধারণতঃ অবসরপ্রাপ্ত গভর্নমেণ্ট অফিসার। চাকুরি-জীবনে হোমরা-চোমরা ছিলেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে আপিসে লোক নিতেন এবং দরখাস্তকারীদের প্রতি যতটা সম্ভব সুবিচার করতেন। এঁদের ধারণা বধূ-নির্বাচনও অনেকটা কেরানী-নির্বাচনের মতো ব্যাপার। ছেলেদের চাকুরি-লাভ আর মেয়েদের

স্বামী-লাভ এঁদের চক্ষে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। সুতরাং তাঁরা যতগুলি সম্ভব পাত্রীকে চান্স দিতে চান এবং নিক্তির ওজনে যোগ্যতা বিচার করতে চান তাদের। ব্রজেনবাবু কলকাতার বাইরে থাকেন, সুতরাং ঘটক-সম্প্রদায়ের সঙ্গেও তাঁর তেমন যোগাযোগ সম্ভব হয় নি। যে দু'একটি পেশাদারী ঘটক-কোম্পানি নিজেদের যোগ্যতার কথা কাগজে বিজ্ঞাপিত করে' থাকেন তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তিনি। পত্রালাপ করেই বুঝতে পারলেন যে এঁদের দ্বারা তাঁর কাজ হবে না। কারণ এঁরা আগেই টাকা চেয়ে বসলেন। টাকা অর্থাৎ পারিশ্রমিক দিতে ব্রজেনবাবুর আপত্তি ছিল না, কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ দেখে তাঁর সন্দেহ হ'ল কেমন। ও পথে তিনি আর অগ্রসর হলেন না।

অথচ এদিকে মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। হরমোহিনীর রাত্রির নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। ব্রজেনবাবু শেষে ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। তিনি শিক্ষিত লোক, তিনি জানেন যে মেয়ের বিয়েটা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যার জন্যে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করতে হবে। মেয়ে লেখাপড়া শিখছে, এবার বি. এ. পরীক্ষা দেবে, গানবাজনাও শেখাচ্ছেন তাকে। যথাসময়ে কোথাও না কোথাও বিয়ে হবেই তার। তার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে লাভ নেই। কিন্তু তবু তিনি ব্যস্ত হ'তে লাগলেন। হরমোহিনীর প্ররোচনায় এলোপাতাড়ি চিঠি লিখতে লাগলেন। শুধু চিঠি নয়, যার সঙ্গে দেখা হ'তে লাগল, তাকেই বলতে লাগলেন —ভাই, আমার মেয়ের জন্য সৎপাত্র দেখে দাও একটি। খবর আসতে লাগল নানারকম। প্রথম খবর এল দূরসম্পর্কের ভাই হরিমোহনের কাছ থেকে। হরিমোহন একটু তড়বড়ে লোক। তার চিঠি থেকেই সেটা বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি ভাব প্রকাশ করার দিকেই ঝোঁক বেশী, বাক্য সম্পূর্ণ নাই বা হ'ল। তার চিঠিখানি এই।

পূজনীয় ব্রজেনদা,

আশা করি বৌদি ও আপনি ভালই। আমি কথা দিয়েছি তাই পাত্রের সন্ধান দিতেছি। মাঝে মাঝে আরও দেব, সন্ধান পেলেই।

এ ছোকরাটি দামোদর ভ্যালি প্রোজেক্টে কাজ করে। বেশ চনমনে। বি. ই. পাস। নাম হরিশঙ্কর চক্রবর্তী। এস. ডি. ও. পদে অধিষ্ঠান করছেন। বয়স সাতাশ। পিতা জীবিত। কলকাতায় নিজবাটীতে থাকেন। আদি বাড়ি পূর্ববঙ্গ। ঠিকানা সঙ্গীয় চিরকুটে দিলাম। দাদা, আপনি পাত্রের বাবা জয়শঙ্কর চক্রবর্তীকে পত্র দিন। পাত্রটি মধ্যম পুত্র। বড় ছেলেও একজন বড় ইন্‌জিনিয়ার, বিয়ে হ'য়ে গেছে। পত্রপাঠ ব্যবস্থা করুন এবং আমাকেও পত্র দিন। পাত্রটির রং গৌরবর্ণ, নাক মুখ চোখা। ছেলেমেয়েদের স্নেহাশীষ দেবেন। আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—

শ্রীহরিমোহন চট্টো
H. T. C. (Head Ticket Collector)
জামালপুর স্টেশন, জামালপুর।

ব্রজেনবাবু 'আশীষ' বানানটার দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন। তাঁর ধারণা ছিল হরিমোহন বাংলাটা অন্ততঃ ভালো জানে। 'আশীষ' বানানটা দেখে তাঁর সে ভ্রম দূর হ'ল।

হরমোহিনী বললেন, "বাঙালদের ঘরে আমি মেয়ে দেব না। আমি নিজে বাঙালের মেয়ে, বাঙালদের হালচাল আমার জানা আছে। খাটতে খাটতে আমার মেয়ের হাড় কালি হ'য়ে যাবে।"

হরমোহিনী অবশ্য নামে বাঙাল। তাঁর মা বাবা দুজনেই পূর্ববঙ্গের। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেছেন তাঁরা বহুপূর্বে। হরমোহিনীর বাল্যকালটা কেটেছিল ফরিদপুরে। বাঙাল ভাষাটা

পর্যন্ত তিনি ভুলে গেছেন। বাঙালদের কেউ গাল দিলে তাঁর গায়ে লাগে, কিন্তু নিজের মেয়েকে বাঙালদের বাড়িতে দিতে রাজী নন।

ব্রজেন্দ্রবাবু মৃদু হেসে বললেন, "অত ভাবলে কি চলে। আজকাল অসবর্ণ বিয়েও তো হচ্ছে। একটা চিঠি লিখে দেখতে ক্ষতি কি—। পাত্রটি ভালো। আমার তো যতগুলি বন্ধু আছে তাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের লোকই বেশি। ওরা খুব সিন্‌সিয়ার লোক হয়—"

হরমোহিনী দেবীর স্বামীকে ভর্ৎসনা করবার একটা বিশেষ স্টাইল আছে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে চোখ বড় বড় করে' নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন স্বামীর দিকে কয়েক মুহূর্ত, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে স্থানত্যাগ করেন। এবারও তাই করলেন। অন্য সময়ে এতে বেশ কাজ হয়, কিন্তু এবার হ'ল না। ব্রজেন্দ্রবাবু অনুভব করলেন যে পরিবারের এই খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করলে মেয়ের বিয়ে হবে না। আমাদের সমাজে সৎপাত্র খোঁজা মানে রাবিশের স্তূপ থেকে স্বর্ণকণিকা আহরণ করা। রাবিশের স্তূপ ঘাঁটতেই হবে। বিখ্যাত কবিতাটার দু'চরণ মনে পড়ল।—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

সুতরাং তিনি চিঠি লিখলেন একটি। তিনি অনেক চিঠি লিখেছিলেন এই ব্যাপারে, একটি নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করছি :

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। খবর পাইলাম আপনার মধ্যম পুত্রটির এখনও বিবাহ দেন নাই। আমার কন্যার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া তাই এই পত্র লিখিতেছি। আমার কন্যার বয়স কুড়ি বৎসর। সে এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবে। রং খুব ফর্সা না হইলেও কালো নয়।

সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী। লম্বা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ভালো সেতার বাজাইতে পারে। শিল্পকর্মও কিছু কিছু জানে। খুব ভালো আলপনা দেয়। রন্ধনাদিতেও নিপুণ। আমাদের আদি নিবাস হুগলি জেলায়। ত্রিবেণীর সন্নিকটে একটি গ্রামে। সেখানে পূর্বপুরুষদের ভিটা পড়িয়া আছে। কেহই আর সেখানে বসবাস করে না। আমরা তিন ভাই কর্মোপলক্ষ্যে তিন জায়গায় থাকি। আমার তিন ছেলে। একজন অধ্যাপক, একজন ডাক্তার এবং একজন ইন্‌জিনিয়ার। তিনজনেরই বিবাহ দিয়াছি, তিনজনই কর্মে নিযুক্ত। কন্যাটিই কনিষ্ঠা। আমরা অধ্যাপকের বংশ। আমাদের পূর্বপুরুষদের টোল ছিল, সেখানে তাঁহারা অধ্যাপনা করিতেন। আমিও এম. এ. পাস করিয়া কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও পথ পরিত্যাগ করিতে হইল, কারণ বেতনস্বরূপ যাহা পাইতাম তাহাতে কুলাইত না। আমার এক মাড়োয়ারি ছাত্র আমার বিশেষ ভক্ত ছিল। তাহারই পরামর্শে এবং অর্থানুকুল্যে গেঞ্জির ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছি। সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম হয়তো আপনি শুনিয়া থাকিবেন। সেই মিলের অর্ধেক অংশ আমার। আপনি যদি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমাদের বিস্তৃততর পরিচয় আপনাকে জানাইব। মেয়ের ঠিকুজির নকল এই সঙ্গে পাঠাইলাম। যদি ইচ্ছা হয় মিলাইয়া দেখিবেন। আমার প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গৃহিণীকে না জানিয়েই চিঠিটি পোস্ট করে' দিলেন তিনি।

ছুই

জয়শঙ্কর চক্রবর্তী লম্বা শুঁটকো লোক। গায়ের রং কুচকুচে কালো। থেলো হুঁকোয় হরদম তামাক খান বলে' সাদা গোঁফে লালচে ছোপ ধরেছে। যখন বাইরে বেরোন তখন বিড়ি খান। অন্য কিছু পছন্দ নয় তাঁর। ব্রজেনবাবুর চিঠি যখন এল তখন তিনি ন'হাতি একটি কাপড় পরে' উবু হ'য়ে বসে' তামাক খাচ্ছিলেন। কাজে বেরুবার আগে এইটেই তাঁর দৈনন্দিন কর্ম এবং বিলাস। আগে সরকারী ইন্‌জিনিয়ার ছিলেন এবং সেই সময় কলিকাতার অভিজাত পল্লীতে একটি চারতলা বাড়ি করিয়েছেন। নিজে চারতলায় থাকেন, বাকি তিন তলা ভাড়া দিয়েছেন। ভাড়া থেকেই মাসে হাজার দেড়েক টাকা আসে। তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন বটে কিন্তু পেন্সনটির উপর নির্ভর করে' বসে' নেই। উদ্যোগী পুরুষ। কণ্ট্রাকটারি করেন। দালালিও করেন। তাছাড়া ফাটকা খেলেন, শেয়ার-মার্কেটে গতিবিধি আছে। টাকার অভাব নেই। অভাব সুখের। একটি মেয়ে বিধবা হয়েছে। কিন্তু সে বিধবার মতো থাকে না। রঙীন শাড়ি পরে, হোটেলে মাছ মাংস খায়। সংস্কৃতির নামে বেলেল্লাগিরি করে' বেড়ায়। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গোঁড়া হিন্দু, সুতরাং সেখানে তার স্থান হয় নি। মেয়েটি জয়শঙ্করের স্কন্ধারূঢ়া হ'য়ে আছে।

জয়শঙ্কর তাকে কিছু বলতে সাহস করেন না। তাঁর ভয় হয় কিছু বললে হয় আত্মহত্যা করবে না হয় পালিয়ে যাবে। এম. এ. পাস মেয়ে, মুখের উপর কিছু বলাও শক্ত। গিন্নীর ভয়েও চুপ করে' থাকতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় গিন্নীই মেয়েকে যথেচ্ছাচার করবার অবাধ অনুমতি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি সহজ এবং জোরালো।

সামাজিক পথে তাঁর মেয়ের যখন সাধআহ্লাদ মিটল না, তখন স্বাভাবিক পথেই তা মিটুক। টাকার জোর থাকলে সমাজে কিছুই যখন আটকায় না, তখন আর ভাবনা কি। মেয়ে সেজেগুজে চারতলার ঘরে বসে' যতক্ষণ পিয়ানো বাজাতে চায় বাজাক। যত বয় ফ্রেণ্ডের সঙ্গে আড্ডা দিতে চায় দিক। যত সংস্কৃতি-সভা করতে চায় করুক। কন্যার বৈধব্যের জন্য জয়শঙ্করবাবুকেই দায়ী করেছেন তাঁর গৃহিণী। বিয়ের সময় নাকি ঠিকুজি মেলানো হয় নি। বিয়ের পর দেখা গেল কন্যার রাক্ষসগণ আর বরের নরগণ। সুতরাং কন্যার প্রসঙ্গ উঠলেই জয়শঙ্করবাবু বাইরে একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তিনি খুবই চটে' যান সেটা বোঝা যায় তাঁর থেলো হুঁকোর ভড়াক ভড়াক শব্দ শুনলে।

ছেলেদের নিয়েও সুখ নেই তাঁর। বড় ছেলে বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ার হ'য়ে এসেছে। কিন্তু বিলেত থেকে সে শুধু ডিগ্রিই আনে নি, একটি মেমসায়েব বউও এনেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চলে আলাদা বাড়িতে থাকে। একটি ছেলে হয়েছে। মেম মা ছেলের নাম রেখেছে চার্লি।

মধ্যম পুত্রটি বাধ্য, কিন্তু বাবার বাধ্য নয়, মায়ের বাধ্য। সে বলেছে মা যে মেয়েকে পছন্দ করবে তাকেই বিয়ে করবে সে। মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে অনেক। কিন্তু ভদ্রমহিলা পছন্দের যে ফরম্যুলা বানিয়েছেন তা কোন মেয়েকেই ফিট্ করছে না। ডানাকাটা পরী তিনি চান না, অথচ শ্যামবর্ণ মেয়েও পছন্দ নয়, মেয়ে মূর্খ হ'লে চলবে না, অথচ আই. এ. পাস অনেকগুলি মেয়েকে অপছন্দ করেছেন তিনি। বি. এ. পাস মেয়ে তো চলবেই না, কারণ তাঁর মতে বি. এ. পাস মানে বুড়ী। মেয়ের বাপ মা-রা মেয়ের যে বয়স বলেন তা তাঁর বিশ্বাস হয় না।

জয়শঙ্কর তামাক খেতে খেতে ব্রজেনবাবুর চিঠিটি পড়লেন। তারপর গৃহিণীকে ডেকে দিলেন চিঠিখানি। তাঁর মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত, তিনি যে রকম উত্তর লিখতে বলবেন তাই তিনি লিখে দেবেন। চিঠিখানি দিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলেন। আধঘণ্টা পরে যখন বেরুলেন তখন গৃহিণী বললেন, "ঘটির লগে কাম করুম্ না।" তখন জয়শঙ্করবাবুর মনে পড়ল বিক্রমপুরের মেয়ে ছাড়া অন্য মেয়ে চান না তিনি।

সুতরাং জয়শঙ্কর ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তর দেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না। একটা পোস্টকার্ড মানেই পাঁচ নয়া পয়সা। অনর্থক অর্থব্যয়ের তিনি পক্ষপাতী নন।

তিন

তিনকড়ি মজুমদার কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। উত্তর দিতে দেরিও করেন নি, উত্তরের মধ্যে ঝাপসাও কিছু রাখেন নি।

ব্রজেনবাবু এ ভদ্রলোকের খবর পান তাঁর এক দালালের মারফত। তাঁর দালাল শ্রীধর নাগ জহুরী লোক। গেঞ্জির দালালি করতে তাঁকে অনেক জায়গায় যেতে হয়। তিনি কলিকাতাবাসী তিনকড়ি মজুমদারের খবরটি নিয়ে এলেন। বললেন, টালিগঞ্জে প্রকাণ্ড বাড়ি ভদ্রলোকের। ছয় ছেলে, ছ'জনই এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। প্রত্যেকটি ইন্‌জিনিয়ার, প্রত্যেকেই বড় চাকরি করে। আর কি চেহারা সব! রাজপুত্র বলতে চান বলতে পারেন, কন্দর্পকান্তি বলতে চান তাও বলতে পারেন। কোনটাই বেমানান হবে না। আর বাপের চেহারা কি, যেন শিবটি। অবশ্য একটু তফাত আছে। মাথায় জটা নেই, গলায় সাপ নেই, দিগম্বরও নন (ঝোলা পাজামা

পরেন)—কিন্তু আর সব মিল। নধর ভুঁড়ি, প্রশান্ত হাসি, চোখের দৃষ্টি থেকে যেন ক্ষমা ঝরে' পড়ছে। তাঁর ঠিকানা এনেছি। আজই চিঠি লিখুন তাঁকে। তাঁর পাঁচ ছেলের বিয়ে হ'য়ে গেছে, কেবল ছোটটি বাকি। মেয়ের বাবারা ছেঁকে ধরেছে ভদ্রলোককে। আপনি আজই চিঠি লিখুন। নাগ মশায় ঠিকানা এনেছিলেন। ব্রজেনবাবু অবিলম্বে চিঠি লিখে দিলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই উত্তরও এসে গেল :

মান্যবরেষু—

আপনার ৪।১০ তারিখের পত্র পাইয়াছি। যে ঠিকুজি পাঠাইয়াছেন তাহার সহিত আমার পুত্রের ঠিকুজির রাজযোটক মিল হইয়াছে। কিন্তু কন্যার ছকে কুজগ্রহ কোথায় আছে তাহা ধরিতে পারিলাম না। প্রথম যৌবনে জ্যোতিষ লইয়া কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম। কুজগ্রহ যে দাম্পত্যজীবনে নানা বিঘ্নকারক তাহা মনে আছে। কুজগ্রহই কি মঙ্গল? অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

আপনাকে প্রসিদ্ধ গেঞ্জি ব্যবসায়ী ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়া অনুমান করিলে কি ভুল হইবে? আপনার সহিত কুটুম্বিতা কাম্য মনে করি। আপনি শ্রদ্ধেয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ইহা কম কৃতিত্ব নহে। এইবার আমাদের পরিচয় শুনুন। আমরা ঢাকার বাঙাল। পাকিস্তান ভদ্রাসন গ্রাস করিবার পরে টালিগঞ্জে ছোট একখানা দ্বিতল বাড়ি করাইয়া বাস করিতেছি। আমার ছয় পুত্র, সবগুলিই ইন্‌জিনিয়ার ও ভারত গভর্নমেণ্টের অধীনে কর্মে নিযুক্ত। পাত্র কনিষ্ঠ, বয়স সাতাশ। কিছুদিন পূর্বে সে

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধীনে ভাল চাকুরি পাইয়াছে।

আপনি লিখিয়াছেন পাত্রী সুশ্রী। সুশ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত গৌরাঙ্গী না হইলে এ পরিবারে শানাইবে না। আর একটা কথাও পূর্বেই পরিষ্কারভাবে বলিয়া রাখা উচিত মনে করি। জীবন-যুদ্ধে নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। চড়াসুদে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কর্জ করিতে হইয়াছে। পাঁচ ছেলের বিবাহ দিয়া ত্রিশ হাজার টাকা শোধ করিয়াছি। কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহে পাঁচ হাজার টাকা পণ লইয়া বাকিটা শোধ করিয়া দিব। সুদের বোঝা আর টানিতে পারিতেছি না। ইহা ছাড়া গহনা-পত্র বরাভরণ প্রভৃতিও আপনাকে দিতে হইবে। আমি কোনও কিছুই ঝাপসা রাখিতে চাহি না। মনে হয় আপনার হাজার বিশেক টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে কন্যাটি পছন্দ হওয়া দরকার। আপনি দূরে থাকেন, আপনার পক্ষে কন্যা লইয়া আসা একটু শক্ত, আমাদের পক্ষেও যাওয়া সহজ নয়। আপনাদের যদি কোনও আত্মীয় কলিকাতায় থাকেন তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইলে সুবিধা হয়। তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া কন্যার রূপের সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ পাইব। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া যদি বুঝি যে কন্যা প্রকৃত গৌরাঙ্গী তাহা হইলে আপনাকে কন্যা লইয়া এখানে আসিবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার আত্মীয়কে বলিবেন টালিগঞ্জে চারু অ্যাভেনিউ রোডে পৌঁছিয়া আমার নাম করিলেই অনেকে আমার বাড়ি দেখাইয়া দিবে। বাড়ির রং গোলাপী। বাড়ির নাম বঙ্গকুটির। বাড়ির নম্বর ৩৫।১। চিনিতে কষ্ট হইবে না।

গৌরবর্ণ বর্তমান বাঙ্গালীদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায়

না। ফরসা রংও বিভিন্ন চক্ষে বিভিন্ন রকম দেখায়। রবীন্দ্রনাথের মায়ের চক্ষে রবীন্দ্রনাথ কালো ছিলেন! সুতরাং আপনার আত্মীয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তবে আপনাকে কন্যা আনিতে অনুরোধ করিব। গৌরবর্ণ সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে।

নমস্কার ও প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীতিনকড়ি মজুমদার।

হরমোহিনীর এ প্রস্তাবে দুটি আপত্তি ছিল। প্রথম ওরা পূর্ববঙ্গের, দ্বিতীয় ওদের উপাধি মজুমদার। তাঁর ইচ্ছা পাত্রের উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায় হোক আর বাড়ি হোক কলকাতায়। যদিও কল্‌কাতিয়াদের নিয়ে তিনি সুযোগ পেলেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে' থাকেন কিন্তু মেয়ের বিয়ে তিনি কলকাতাতেই দিতে চান। ব্রজেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান লোক। স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করে যে লাভ নেই এ অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। তিনি কেবল বললেন,—যা বরাবরই বলে' আসছেন,—"চেষ্টা করে' দেখতে ক্ষতি কি। পাত্রটি ভালো। ভদ্রলোক কলকাতাতেই যখন বাড়ি করেছেন, তখন তো কলকাতার লোকই হ'য়ে গেছেন। আমি শিবুকে লিখে দিচ্ছি ওঁর সঙ্গে দেখা করে' আসুক। কুড়ি হাজার টাকা কোনক্রমে যোগাড় করব। ধারধোর করে'। পাত্রটি বড় ভালো।"

ব্রজেন্দ্রবাবুর শ্যালকের নাম শিবতোষ না হ'য়ে কৃষ্ণতোষ হ'লে বেশী মানাতো। কুচকুচে কালো রং। বলিষ্ঠগঠন কোল বা সাঁওতালের মতো দেখতে। ব্রজেন্দ্রবাবুর নির্দেশে শিবতোষই

তিনকড়িবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনকড়িবাবু নাকি তাকে আপাদমস্তক একবার দেখে একটি প্রশ্নই করেছিলেন, "আপনার ভাগ্নী কি আপনারই মতো দেখতে ?"

শিবতোষ ভালমানুষ লোক। অত ঘোরপ্যাঁচের ধার ধারে না। বলেছিল, "কিছুটা মিল আছে বই কি। হাজার হোক ভাগ্নী তো। তবে আমার মতো এতো কালো নয়।"

তিনকড়িবাবু আর কোন কথা জিগ্যেস করেন নি। ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠির উত্তরে সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন—"আপনার শ্যালকের সহিত আলাপ করিলাম। বুঝিলাম আমরা পাত্রী যেরূপ চাই আপনার কন্যা সেরূপ নহে। সুতরাং এ বিষয়ে আর কথা বাড়াইতে চাহি না। আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চিঠি পেয়ে খুব দমে গেলেন। তাঁর মেয়ে যে কারও অপছন্দ হবে এ ভয় তাঁর ছিল না। তাঁর ভয় ছিল অত টাকা যোগাড় করতে পারবেন কি না। কিন্তু তাঁর ভক্ত এবং পার্টনার সুন্দরমল আশ্বাস দিয়েছিলেন তাঁকে—আপনি ভালো পাত্র ঠিক করুন, টাকার ভার আমি নিলাম। এই আশ্বাসে তাঁর মন চিন্তামুক্ত হ'য়ে নির্মেঘ আকাশের মতো হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তিনকড়িবাবুর চিঠি পেয়ে আবার মেঘ জমতে লাগল।

হরমোহিনী কেবল বললেন, "হয় নি বাঁচা গেছে। ও বাড়িতে আমার মেয়ের সুখ হ'ত না। দেখেছি তো, পূর্ববঙ্গে বউদের ভয়ানক খাটায় !"

ব্রজেন্দ্রবাবু কয়েকদিন চুপ করে' রইলেন। মনের বিমর্ষ ভাবটা কাটতে কয়েকদিন লাগল তাঁর। মাঝে মাঝে এ-ও মনে হচ্ছিল, যাক্ গে, যা হয় হবে, আর পারা যায় না। কিন্তু এ নিবৃত্তিমার্গে বেশীদিন তিনি চলতে পারলেন না। তাঁর বিবেক তাঁকে বলতে

লাগল—'তুমি অন্যায় করছ, কর্তব্যে অবহেলা করছ।' তাঁর অহংকার তাঁকে ওসকাতে লাগল—'তুমি সৎপাত্র যোগাড় করতে পারবে না? কিসের অভাব তোমার! তোমার মিলের দেশজোড়া নাম। সুন্দরমলের মতো টাকার কুমীর তোমার ভক্ত। তোমার তিন তিনটি উপযুক্ত ছেলে, এত বন্ধুবান্ধব। তোমার মেয়ের পাত্র জুটবে না? হতাশ হচ্ছ কেন? কাপুরুষরাই হতাশ হয়।'

উত্তেজিত হ'য়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁর তিন ছেলেকে এবং কয়েকজন বন্ধুকে চিঠি লিখলেন।

চার

তাঁর বড় ছেলে অধ্যাপক। সে চিঠি পেয়েই উত্তর দিল বাবাকে।

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। উষার জন্য আমি পাত্রের সন্ধানে আছি। একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। ছেলেটি সম্প্রতি বিলেত থেকে লিটারেচারে ডক্টরেট্ পেয়ে ফিরেছে। আশা করছি ভাল চাকরিই পাবে। তার ঠিকানা নীচে দিলাম। ছেলেটির বাবা নেই, মা-ও নেই। মামারাই বিবাহের কর্তা। বড় মামা রিটায়ার্ড সব-জজ। নাম শশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মুঙ্গেরে থাকেন। তাঁর ঠিকানাও এই সঙ্গে দিলাম। আপনি তাঁকে পত্র লিখুন। আমিও ছেলেটির সহিত এ বিষয়ে আলাপ করব। একদিন তার বাসায় গিয়েছিলাম, দেখা পাই নি। আপনি ও মা আমার প্রণাম জানবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত নরেন।

দ্বিতীয় পুত্র বরেন, ডাক্তার। সে যা উত্তর দিল তা ব্রজেন্দ্রনাথের ভালো লাগল না। ছেলেটা বরাবরই জ্যাঠা। সে লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনি ঊষার বিয়ের জন্য এত ভাবছেন কেন বুঝতে পারছি না। আজকাল মেয়েদের বিয়ের জন্য কেউ ভাবে নাকি। মেয়েরা আজকাল আর সমাজশৃঙ্খলে বন্দিনী নয়। ছেলেদের মতোই তারা স্বচ্ছন্দে চলতে ফিরতে আরম্ভ করেছে। বিয়ে যথাসময়ে এবং যেখানে হোক হবে। ঊষা নিজেই পছন্দ করে' হয়তো বিয়ে করবে কাউকে। জোর করে' কারো ঘাড়ে একটা বিয়ের জোয়াল চাপিয়ে দেওয়া সমীচীনও নয় সব সময়ে। তাতে তাদের সহজ গতি নষ্ট হ'য়ে যায়, অনেক সময় জীবনই দুর্বহ হ'য়ে পড়ে। আজকাল মেয়েরা তো নিজেদের পায়ে বেশ দাঁড়াতে শিখেছে, তারা ডাক্তার হচ্ছে, শিক্ষক হচ্ছে, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, ব্যারিস্টার হচ্ছে, উকীল হচ্ছে, পুলিসবিভাগেও ঢুকছে। কেরানী, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট তো অজস্র। মেমসায়েব নার্স আজকাল বিরল, তাদের জায়গা নিয়েছে আমাদের দেশের মেয়েরা। মেয়েদের স্কোপ অনেক, ছেলেদের চেয়েও বেশী। ঊষা লেখাপড়ায় ভালো, সে এম. এ. পড়ুক। তারপর বিলেতে গিয়ে একটা ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসুক। ওর যে রকম সাহিত্য-প্রীতি, তাতে মনে হয় ওদেশের কোনও বড় ইউনিভার্সিটি থেকে ও ডি. লিট্. হ'য়ে আসতে পারবে। আপনি ওর বিয়ের জন্যে যে টাকা খরচ করবেন তার চেয়ে ঢের কম টাকায় ওর উজ্জ্বল 'কেরিয়ার' হ'য়ে যাবে। যাই হোক আপনি যখন লিখেছেন তখন পাত্রের সন্ধানে থাকব। আপনি

অনর্থক চিন্তিত হবেন না। আজকাল মেয়ের বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানে হয় না। আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত বরেন।

তৃতীয় পুত্র হরেনের উত্তর এল কয়েকদিন পরেই।

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, আপনি উষার জন্যে ইন্‌জিনিয়ার পাত্র খুঁজতে বলেছেন, আমি কয়েকটি পাত্রের খবর দিলাম। আমি ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। কুমুদকান্তি আমার সঙ্গে শিবপুরে পড়ত। পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু গোঁড়া কমিউনিস্ট। তার বিশ্বাস আমাদের দেশেও পুরোপুরি মজদুররাজ হ'য়ে যাবে আর সেই রাজ্যের সে হবে ক্রুশ্‌চেভ.। তাছাড়া বড্ড বেশী সিগারেট খায়। রোজ প্রায় তিন প্যাকেট। অন্য ছেলেগুলির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। একটি ছেলে যাদবপুরের, আর একটি খড়্গাপুরের। আপনি ইন্‌জিনিয়ার পাত্রের উপর এত ঝোঁক দিচ্ছেন কেন বুঝতে পাচ্ছি না। আমি নিজে ইন্‌জিনিয়ার হ'য়ে দেখছি এ অতি ওঁছা প্রফেসন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছুটি নেই। আর যতসব অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে কাজকর্ম। সন্ধ্যের পর ক্লাবে বা আড্ডায় যাদের সঙ্গে দেখা হয় তারা সব নির্জলা স্নব। ভদ্রলোক তো কই চোখে পড়ল না এখনও। অন্য প্রফেসনের তুলনায় রোজগার কি খুব বেশী? গভর্নমেণ্টের চাকরিতে মাইনে খুবই কম। প্রাইভেট সার্ভিসে বেশী মাইনে দেয় বটে, কিন্তু সিকিউরিটি নেই। আর খাটতেও হয় খুব বেশী।

তাছাড়া আর একটা কথা মনে হয়। চারিদিকে যে রকম রেটে হু হু করে' ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ আর স্কুল হচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে ইন্‌জিনিয়ারদের বাজারদরও কমে যাবে। আপনি যদি বলেন অন্য পাত্রেরও চেষ্টা করতে পারি। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি ছেলে আমার সঙ্গে পড়ত। ভারি ভালো ছেলে। আমাদের পালটি ঘর। এখন মফঃস্বলের কোনও কলেজে প্রফেসারি করছে। প্রাইভেট কলেজ, মাইনে দু'শ টাকার বেশী নয়। পরে উন্নতি হবে। যদি বলেন এর সঙ্গে সম্বন্ধ করি। এদের পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। সবাই খুব ভালো। আমার মনে হয় উষা এখানে সুখে থাকবে। তবে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের মতো থাকতে হবে। আমার শরীর আপাততঃ ভালো আছে। মাঝে কয়েকদিন জ্বরে ভুগে উঠলুম। ডাক্তারবাবু বললেন, 'লু' লেগেছে। সমস্ত দিন সাইটে দাঁড়িয়ে কাজ করাতে হয়, বিশ্রাম করবার যে জায়গাটুকু, তাও টিনের। এখন ভালো আছি।

আপনি ও মা আমার প্রণাম নেবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। এই গরমে জাম্বু আর ভুটান কেমন আছে? ইতি—

প্রণত

হরেন।

জাম্বু ভুটান কুকুরের নাম। দুটি কুকুরই হরেনের খুব প্রিয়।

তিন ছেলের চিঠি নিয়ে আলোচনা হ'ল কর্তা-গিন্নীর মধ্যে। ব্রজেন্দ্রকুমার বরেনের উপর চটেছিলেন বলেই হরমোহিনী তার পক্ষ অবলম্বন করলেন।

বললেন, "ও তো মিছে কথা লেখে নি কিছু। তোমরা এতকাল

দুপায়ে মেয়েদের থেঁৎলে আধমরা করে' রেখেছিলে, এইবার তারা রুখে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াবেই তো। তোমরা যে বড্ড বাড়িয়েছিলে। ঠিক লিখেছে বরেন—”

ব্রজেন্দ্রকুমার তাঁর পতিব্রতা স্ত্রীর একটি বৈশিষ্ট্য বরাবরই লক্ষ্য করেছেন। যখনই এই ধরনের কথা হয় তখনই হরমোহিনী তাঁকেই শত্রুপক্ষ মনে করে' পাঁয়তারা করেন। একমাত্র তিনিই যেন মেয়েদের দুর্দশার জন্য দায়ী। মুখে তিনি যদিও 'তোমরা' বলেন, কিন্তু তাঁর চোখ মুখ দেখে মনে হয় বহুবচনটা বাহুল্যমাত্র। পুরুষরাই মেয়েদের উপর নানা অত্যাচার করেছে এ কথাটা ইতিহাসসম্মত। কিন্তু যে সব কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু তা সত্বেও যে সব কথা মোটেই কম সত্য নয়, তা হচ্ছে এই যে সব দেশে মেয়েমানুষরাই পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে। ইতিহাসেও পড়া যায় বড় বড় যুদ্ধের মূলে মেয়েমানুষ। আমাদের দেশেও মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের নির্যাতনটা হয়তো পুরুষদের হাত দিয়েই হয়—কিন্তু সে হস্ত নিয়ন্ত্রণ করে অনেক সময় মেয়েরাই। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এত কথা হরমোহিনীকে বললেন না। তিনি জানেন, বলে' লাভ নেই। হরমোহিনীর মনোগত ইচ্ছাটা যে কি তাও তিনি জানেন, সুতরাং সেই পথে আক্রমণ করলেন।

বললেন, "বরেনের মতেই যদি তোমার মত হয় তাহলে আর এতো পাত্র খোঁজাখুঁজির দরকার কি। ওকে পড়ানোই যাক। বিলেত পাঠাবারই ব্যবস্থা করি না হয়—”

ঝেঁজে উঠলেন হরমোহিনী।

“যা হয় না, হবে না, হ'তে পারে না তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি। তোমার ওই আদুরে মেয়ে চাকরি করতে পারবে, না বিলেত যেতে পারবে? এখনও সামনে বসে খাওয়াতে হয়। সবাই কি

সব পারে ? মেয়েটিকে যে রকম আদুরে করেছ তাতে বিয়ে দেওয়া ছাড়া গতি নেই, তা-ও যা তা ঘরে দিলে চলবে না। ভালো করে দেখে শুনে দিতে হবে যাতে সেখানে খাপ-খাইয়ে সুখে থাকতে পারে। বরাবর পইপই করে বলেছি মেয়েকে অত আদর দিও না, মেয়েকে অত আদর দিতে নেই। কার হাঁড়িতে চাল দিয়েছে এক ভগবান ছাড়া তো আর কেউ জানে না, নিজেদের সেই বুঝে চলতে হবে। কিন্তু তুমি কি আমার একটি কথাও শুনেছ কখনও ?"

কোনও সতী রমণীকে মিথ্যাবাদিনী বলা উচিত নয়, ভদ্রতার আইনে আটকায়। ব্রজেন্দ্রনাথ অনায়াসে বলতে পারতেন যে তিনি মেয়েকে একটু-আধটু প্রশ্রয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার মাথাটি চিবিয়ে খেয়েছেন হরমোহিনী নিজে। উষার খাওয়ার নানারকম বাছবিচার। বেগুন খাবে না, পোস্ত খাবে না। ছোট মাছ ছোঁবে না। গৃহস্থ ঘরের ছেলে-মেয়েরা চিরকাল বাসী রুটি আর তরকারি খেয়েছে, কিন্তু উষা তা খাবে না। তার চাই মাখন দেওয়া টোস্ট, বিস্কুট, জ্যাম জেলি। মাংসটি খুব প্রিয়। কিন্তু কোন্ গৃহস্থ ঘরে রোজ মাংস হয় ! ব্রজেন্দ্রনাথ আগে আগে হরমোহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছিলেন এদিকে। কিন্তু হরমোহিনী গ্রাহ্য করেন নি। তখন তাঁর যুক্তি ছিল—"ভবিষ্যতে কি হবে তাই ভেবে এখন থেকে ওর খাওয়া বন্ধ করে' দেব না কি ! ভবিষ্যতে ওর অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে ভবিষ্যতেই সেটা ও ভোগ করবে। এখন থেকে সেটা ভোগ করে লাভ কি। ভবিষ্যতে কি হবে তা জানা নেই বলেই তো আরও উচিত এখন ওকে ভালোভাবে খেতে পরতে দেওয়া। আমাদের কাছে যতদিন আছে ততদিন যতটা পারে খেয়ে মেখে নিক, তারপর অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। তুমি এ নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছ কেন।"
ব্রজেন্দ্রনাথকে থেমে যেতে হয়েছিল। আমতা আমতা করে কেবল

বলেছিলেন, "না আমি বলছি, মানে অভ্যাসটা একবার বিগড়ে গেলে পরে বদলানো শক্ত হবে তো। বদলাতে কষ্টও হবে। হয়তো ওই নিয়েই মনোমালিন্য হবে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে—"

"তা হোক, তাই বলে এখন থেকে ওকে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়ে আধপেটা খাইয়ে রাখতে পারব না"—এই বলে' হরমোহিনী ধামা-চাপা দিয়েছিলেন ব্যাপারটার উপর। পরে এসব নিয়ে আর আলোচনাও করেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ। ওদের শাড়ি ব্লাউস আগে নিজেই দোকান থেকে কিনে আনতেন। কিন্তু এখন আর আনেন না। এ ছিট ভালো নয়, ও রংটা ম্যাটমেটে, এত মোটা কাপড় কি পরা যায়, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউস ম্যাচ করে নি—এইরকম নানা বায়নাক্কা। আর এ সমস্তর প্রশ্রয় দিয়েছেন হরমোহিনী। তিনি নিজেই এখন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যান এবং নিজেদের পছন্দমতো কাপড়-চোপড় কেনেন। আর সেই ভদ্রমহিলাই এখন অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে ব্রজেন্দ্রনাথই মেয়েকে আদুরে করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার!

আর তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "হরেন যে প্রফেসার ছেলেটির কথা লিখেছে তাদের চিঠি লিখব?"

"না, প্রফেসার ছেলের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দেব না। তুমি তো নিজে প্রফেসার ছিলে। প্রফেসারদের যে কি দুর্দশা তা কি তুমি জান না? যতদিন প্রফেসার ছিলে ততদিন হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে দেনার জ্বালায় অস্থির, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে দিতে পারতুম না, সাধ-আহ্লাদ বলে' কিছু ছিল না, বাবা যে ক'গাছা চুড়ি দিয়েছিলেন, ক্ষয়ে' গিয়েছিল সেগুলো—"

যতই দিন যাচ্ছে হরমোহিনী তাঁর বিগত জীবনের কাহিনীটা

ক্রমশঃই অতিরঞ্জিত করে' তুলছেন। তিনি ভুলে গেছেন যে ওই প্রফেসারি করতে করতেই তিনি তাঁকে সোনায় বিছে গড়িয়ে দিয়েছিলেন, শাড়িও কম কিনে দেন নি, ঢাকাই, মুর্শিদাবাদী, বেনারসী, এমন কি জর্জেটও। স্ত্রীকে গয়না কাপড় কিনে দিয়ে কেউ রসিদ নেয় না, তিনিও নেন নি। নিলে এখন প্রমাণ দেখাতে পারতেন।

হঠাৎ চটে' উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

ছু'হাত উপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে। পুরোনো কাসুন্দি কত আর ঘাঁটবে? প্রফেসারির উপর এতই যখন রাগ নরেনকে প্রফেসার হ'তে দিলে কেন?"

"আমি কি দিয়েছি? যখন আই. এস-সি পাস করলে তখনই বলেছিলাম ডাক্তারি বা ইন্‌জিনিয়ারিতে ঢুকে পড়। ছেলে বললে আমি অঙ্ক পড়ব। অঙ্ক আমার খুব ভালো লাগে। শুনলে না কি আমার কথা! হুবহু তোমার স্বভাবটি পেয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন যেদিক দিয়েই তিনি যাচ্ছেন চোট্ খেতে হচ্ছে। তাই রণে ভঙ্গ দেওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। হনহন করে বৈঠকখানায় চলে' গেলেন।

আহার এবং দিবানিদ্রার পর অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। ব্রজেন্দ্রনাথ এবং হরমোহিনী ছু'জনেরই মেজাজ শরীফ। হরমোহিনী ইদানীং যা অনেককাল করেন নি সেদিন তাই করলেন। স্বহস্তে এক কাপ চা ছেঁকে নিয়ে এসে কোমলকণ্ঠে বললেন, "নরু ওই যে বিলেতফেরত ছেলেটির কথা লিখেছে তারই মামাকে চিঠি লিখে দাও না একখানা—"

"সে ছেলে তো ডি. লিট্. । শেষ পর্যন্ত প্রফেসারই হবে। তুমি তো প্রফেসার জামাই চাও না—"

"বিলেতফেরত যখন, তখন প্রফেসারি পেলেও বড় চাকরি পাবে। আমাদের স্বদেশী গভর্নমেণ্টে বিদেশী ডিগ্রিরই কদর বেশী। নরু ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল, আর নরুর বন্ধু গজেন পেয়েছিল সেকেন ক্লাস। গজেনের বাপের টাকা ছিল, বিলেত পাঠিয়ে দিলে ছেলেকে। সে একটা ডিগ্রি নিয়ে ফিরে অনেক বেশী মাইনের চাকরি করছে। নরুও বিলেত যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তখন তুমি বললে আমার হাতে টাকা নেই।"

ম্লানমুখে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "টাকা তো ছিলই না। দেখি উষার বিয়েটা হ'য়ে যাক তখন চেষ্টা করব—"

"ওই ছেলেটির মামাকে আজই লিখে দাও একখানা চিঠি। অমন ভালো ছেলে বাজারে বেশীদিন পড়ে' থাকবে না।"

"বেশ দিচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ চা পান শেষ করে' সুগন্ধি জরদা সহযোগে এক খিলি পান খেলেন। এইটেই তাঁর একমাত্র বিলাস। হরমোহিনী জুলজুল করে' চেয়ে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের হার্ট খুব সবল নয়, ডাক্তার জরদা খেতে মানা করেছেন। সেই মানার পরোয়ানাটা হরমোহিনীই যখন তখন স-ঝংকারে আস্ফালন করেন। এখন কিন্তু কিছু বললেন না। তাঁর মনে হ'ল এখন ওর মেজাজটা খিঁচড়ে দিয়ে লাভ নেই। ভালো মনে চিঠিটা লিখুক।

'বিহিত সম্মানপুরঃসর সবিনয় নিবেদন' এই পাঠ ফেঁদে মেয়ের বাবা ব্রজেন্দ্রনাথ ছেলের মামা শশীনাথকে চিঠি লিখতে বসলেন। হরমোহিনী ঠাকুরঘরে গিয়ে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণতা হলেন জগদ্ধাত্রীর ছবির সামনে আর মনে মনে বলতে লাগলেন, মা দয়া কর, দয়া কর।

পাঁচ

পাত্রের মামা শশীনাথ অনেকদিন মুনসেফি করার পর সব-জজ হয়েছিলেন। বেশী দিন জজিয়তি করতে পান নি। সব-জজ হবার মাস ছয়েক পরেই তাঁকে রিটায়ার করতে হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও এক্স্‌টেন্‌শন পেলেন না। এর জন্যে তাঁর স্ত্রী নাকি বাবা তারকেশ্বরের কাছে ধরনা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা দয়া করেন নি। শশীনাথের ধারণা তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি কেউ কখনও। স্কুলে মাস্টাররা পক্ষপাতিত্ব করে' কখনও ভালো নম্বর দেন নি তাঁকে। কলেজ জীবনেও প্রফেসাররা বিশেষ আমোল দিতেন না। তাঁর সহপাঠীরা প্রফেসারদের বাড়ি গিয়ে অনেক সময় অনেক কাজ আদায় করে' নিত, কিন্তু তিনি কখনও পারেন নি। তিনি মুখ ফুটে তেমন দাবিও করতে পারতেন না। চাকরি জীবনেও ওপরওলার বকুনি খেয়েছেন চিরকাল, অধিকাংশই অন্যায় বকুনি, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে পারেন নি কখনও। ডাক্তাররা বলেছেন এই সবই না কি তাঁর বর্তমান রোগের কারণ। রোগটা বিশেষ মারাত্মক কিছু নয়। কেউ তাঁর কথার প্রতিবাদ করলে বা অবাধ্য হ'লে, কিংবা তাঁর যদি ধারণাও হয় যে মুখে প্রতিবাদ না করলেও ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করছে, সামনে অবাধ্য না হলেও তাঁর অগোচরে ভবিষ্যতে অবাধ্য হবে—তাহলেই তাঁর সারা মুখমণ্ডলে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসবার মতো হয়, গালের মাংস, থুতনির নীচের মাংস, গলার খানিকটা থরথর করে' কাঁপতে থাকে। মনে হয় তাঁর মুখমণ্ডলে যেন ভূমিকম্প গোছের কিছু একটা হচ্ছে। মুখে একটি কথা বলেন না, যেন দম আটকে বসে' আছেন। অনেক ডাক্তার গুপ্ত সিফিলিস সন্দেহ করেছিলেন,

কিন্তু বার বার রক্ত পরীক্ষা করিয়েও কোন দোষ পাওয়া যায় নি। একজন বিলেতফেরত মনস্তত্ত্ববিশারদ ডাক্তার শেষে বললেন এটা সারাজীবনব্যাপী রিপ্রেশনের ফল। বহুকাল ধরে' মনে যে সব কষ্ট, যে সব ক্ষোভ চাপা ছিল, তারাই নাকি এখন ওইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। তাঁর আর একটা কষ্ট নিজের ছেলে-মেয়ে হয় নি। তাঁর স্ত্রী কনকচাঁপা তাই ক্রমাগত সিনেমা থিয়েটার ঠাকুরঘর আর তীর্থ নিয়ে থাকেন। শশীনাথের ভরসা ভাগ্নেটির উপর। বিলেত থেকে ফেরার পর অনেকেই তাঁকে চিঠি লিখছে। নানারকম চিঠি। অধিকাংশই কাকুতি-মিনতিপূর্ণ। কাকুতি-মিনতির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা নেই। নিজের চাকরী জীবনে তিনি সারাজীবন নিজের উপরওলাদের কাকুতি-মিনতি করেছেন, কোন ফল হয় নি। হাকিম হিসেবে নিজেও তিনি অনেকের কাকুতি-মিনতি শুনেছেন কিন্তু সাক্ষীর মুখে সে সব কাকুতি-মিনতির চেহারা বদলে গেছে। প্রায়ই দেখেছেন যারা বেশী কাকুতি-মিনতি করে তারা বদমায়েস, ভালো অভিনয় করতে পারে।

ব্রজেন্দ্রবাবুর চিঠি পড়ে তাঁর ভালো লাগল। ভদ্রলোক অহেতুক বিনয়-প্রকাশ করেন নি, অশোভনভাবে নিজেকে হীনও করেন নি। সব কথাগুলি শোভন সংযত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। গেঞ্জির মিলটার নামও আছে, সুতরাং পয়সাকড়িও খরচ করবেন বলে মনে হয়।

তাঁর একমাত্র ভগ্নী টুসি বিধবা, তাঁর সঙ্গেই থাকে।

ভাজ কনকচাঁপার সঙ্গে মনের মিল নেই। সে নিজেই আলাদা রেঁধে খায়।

টুসির আশা-আকাঙ্ক্ষা সব এখন টুবলুকে কেন্দ্র করে। ভগবানের দয়ায় ছেলেটি মানুষ হয়েছে, বিলেত থেকে বড় ডিগ্রি নিয়ে এসেছে,

এইবার বোধহয় তার দুঃখ ঘুচবে। দিল্লীর কোন বড় কলেজে নাকি চাকরিরও কথাবার্তা চলছে। এইবার একটি মনোমত বউ পেলেই নিজের স্বপ্নের ছাঁচে আবার আলাদা সংসার পাতবে সে। আঁটকুড়ো ভাজের মুখঝামটা আর সহ্য করতে হবে না। একটা ব্যাপারে কিন্তু টুসি মনে মনে শঙ্কিত হয়েছে। বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর টুবলু তার সঙ্গে কথা কয় না। অধিকাংশ সময় বাড়িতেই থাকে না। অধিকাংশ দিনই বাড়ির বাইরে খায়, হোটেলে, কিংবা বন্ধুদের বাড়িতে। টুসির মনে হয় টুবলু হঠাৎ যেন তার নাগালের বাইরে চলে' গেছে। কি হয়েছে ছেলের ? কিছুই বুঝতে পারে না টুসি। সর্বদাই অন্যমনস্ক। মুখের ভাবভঙ্গী ভালো নয়, কোন কথা জিগ্যেস করতে ভয় করে। শশীনাথবাবুর কাছে অনেক মেয়ের ফোটো এসেছে। টুসি সব ফোটোই টুবলুকে দিয়েছে, টুবলু একনজর মাত্র দেখে রেখে দিয়েছে সেগুলো টেবিলের উপর। পছন্দ হ'ল কি না বলে নি। টেবিলের উপর ফোটোর স্তূপ জমে' গেছে। কিন্তু টুবলুর মত পাওয়া যাচ্ছে না।

শশীনাথবাবু টুসিকে ডেকে বললেন, "এই সম্বন্ধটি ভালো মনে হচ্ছে। ভদ্রলোকের পয়সাকড়ি আছে, নামও আছে। মেয়েটি বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ভদ্রলোক লিখেছেন সুশ্রী। ফোটো পাঠাতে লিখব ? কিংবা টুবলু যদি দেখতে চায় ভদ্রলোককে লিখি মেয়ে নিয়ে আসুন। তুই জিগ্যেস করদিকি টুবলুকে—"

"আমি জিগ্যেস করতে পারব না দাদা। তুমিই বরং কর। বিলেত থেকে ফিরে এসে ও বড্ড বেশী গম্ভীর হ'য়ে গেছে। ওর সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে। অধিকাংশ দিন তো বাড়িতে খেতেই আসে না—"

"আচ্ছা, আমিই জিগ্যেস করব—"

সেই দিনই বিকেলে টুবলু যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল শশীনাথ ধরলেন তাকে।

"টুবলু, শোন। এইবার তোমার বিয়ের একটা ঠিক করতে হবে, তোমার মা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। সম্বন্ধও এসেছে অনেকগুলি। তোমার মত না পেলে উত্তর দিতে পাচ্ছি না কাউকে।"

"আচ্ছা ভেবে দেখব"—বলে টুবলু বেরিয়ে গেল।

ছিটকে বেরিয়ে এল শশীনাথের চোখ দুটো। গালের আর থুতনির মাংস থরথর করে' কাঁপতে লাগল।

ব্রজেন্দ্রনাথ যাহোক একটা উত্তরের প্রত্যাশা করছিলেন। উত্তরটি পেলেন পনরো দিন পরে। শশীনাথের হাতের লেখা ক্ষুদি ক্ষুদি এবং দুষ্পাঠ্য। এই হস্তাক্ষরে জোলো কালিতে তিনি লিখেছেন—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার বারো তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার ভাগিনেয়র অনেক সম্বন্ধ আসিয়াছে। এত আসিয়াছে যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। ফোটার স্তূপ, ঠিকুজির গোছা। সব মেয়েই সুন্দরী। একটি মেয়ে গতবৎসর নফর-নগরশ্রী হইয়াছিল। বিশ্ববার্তা পত্রিকায় তাহার প্রতিকৃতি সম্ভবতঃ দেখিয়া থাকিবেন। আপনি আপনার মেয়ের ফোটো পাঠান নাই। না পাঠাইয়া ভালোই করিয়াছেন, কারণ আমার ভাগিনেয় ফোটোর সংখ্যা দেখিয়া সম্ভবতঃ ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেই একটিমাত্র উত্তর দিতেছে—পরে ভেবে বলব। এ অবস্থায় আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

তাই আপনাকে অনুরোধ আপনি মাসখানেক পরে আর একবার খোঁজ করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

ব্রজেন্দ্রনাথকে আর চিঠি লিখতে হ'ল না। শশীনাথের চিঠি পাওয়ার দিন সাতেক পরে বড় ছেলে নরেনের চিঠি পেলেন তিনি। নরেন লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনাকে যে ডি. লিট. পাত্রটির কথা লিখেছিলাম তার মামাকে কি চিঠি লিখেছেন? যদি না লিখে থাকেন আর লিখবেন না। কাল টুবলুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বললে বাধ্য হ'য়ে তাকে দিল্লীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করতে হচ্ছে। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিটির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নাকি খুবই দহরম-মহরম। তিনি টুবলুকে বলেছেন সে যদি তাঁর মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে তিনি তাকে ক্লাস ওয়ান সার্ভিস পাইয়ে দেবেন। টুবলু দু'টি কারণে ইতস্ততঃ করছিল। প্রথম, মেয়েটি অবাঙালী। দ্বিতীয়, দেখতে খুব খারাপ। কালো, বেঁটে এবং মোটা। বয়সও অনেক, টুবলুর চেয়ে বোধহয় বড়ই হবে। টুবলু চার পাঁচ জায়গায় চাকরির দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু কোথাও তার চাকরি হয় নি, সে হিন্দু বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে এইটেই তার মস্ত অপরাধ। এমন কি বাংলাদেশেও তার দাবিকে অগ্রাহ্য করে একজন অবাঙালীকে নেওয়া হয়েছে। তাই সে ঠিক করেছে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করেই চাকরিটি

যোগাড় করবে। যস্মিন্ দেশে যদাচার—এই তার মত। বেচারা মনে মনে কিন্তু বড্ড দমে' গেছে। আমি অন্য পাত্রের সন্ধানে আছি। পেলেই জানাব। আপনি ও মা প্রণাম জানবেন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণত

নরেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিটি হরমোহিনীকে দিলেন।

হরমোহিনী সংক্ষেপে মন্তব্য করলেন, 'মুয়ে আগুন।'

ছয়

চিঠিখানি পেয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইলেন কয়েকদিন। বেশীদিন কিন্তু পারলেন না। নিজের তাগিদ তো ছিলই, হরমোহিনীও তাগিদ দিতে লাগলেন।

"তুমি যে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে' রইলে। হরেন কয়েকটি ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর দিয়েছিল তাদের চিঠি লেখ না—"

"চিঠি তো অনেক জায়গায় লিখলুম, কোথাও লাগছে যে না।"

"যখন লাগবার লাগবে, খুঁজতে হবে। চুপ করে' হাত গুটিয়ে বসে' থাকলে চলবে না।"

"ভালো লাগছে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানালার ভিতর দিয়ে বহুবার-দেখা ন্যাড়া আমড়া গাছটার দিকে চেয়ে রইলেন। সেদিন আর চিঠি লিখলেন না, তার পরদিন লিখলেন। হরেন তিনটি পাত্রের ঠিকানা পাঠিয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম একটিকেই নির্বাচন করলেন তিনি, তার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাধি দেখে। বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিটার প্রতি হরমোহিনীর তো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব আছেই, তাঁর নিজেরও আছে। এ চিঠি লিখে তিনি ভাবলেন এর উত্তরটা আসুক, যদি লেগে যায় ভালোই, যদি না লাগে তখন বাকী দু'জনকে লেখা যাবে।

কিন্তু এর পর যে দুটো ঘটনা ঘটল, তাতে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাকী দু'জনকেও চিঠি লিখে ফেললেন। এদের একজনের উপাধি চক্রবর্তী। এ উপাধিটা তাঁর পছন্দ নয়, হরমোহিনীর তো নয়ই। হরমোহিনী বলেন যে তাঁদের দেশে চক্রবর্তী মানেই রাঁধুনী বামুন। হয়তো এ খবর ভুল, কিন্তু ওই ভুল আঁকড়েই হরমোহিনী ব'সে আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন। চক্রবর্তী, মজুমদার, রায় প্রভৃতি উপাধি ব্রজেন্দ্রনাথের পছন্দ নয় অন্য কারণে। ওসব উপাধি মুসলমান আমলে রাজানুগৃহীত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছিল। সাহেবদের আমলে এবং স্বাধীনতার আমলেও যে সব লোক খেতাব পেয়েছেন তাঁদের উপর তেমন শ্রদ্ধা নেই ব্রজেন্দ্রনাথের। তাই তির্যকভাবে মুসলমান রাজাদের দেওয়া খেতাবের প্রতিও বীতশ্রদ্ধ তিনি। তাঁর এই মনোভাব হয়তো যুক্তিসম্মত নয়, কিন্তু মানুষ কি সব সময় যুক্তি মেনে চলে?

তৃতীয় যে পাত্রটির জন্য তিনি চিঠি লিখলেন সেটির উপাধি মিশ্র। কেমন যেন বিহারী-বিহারী গন্ধ আছে উপাধিটাতে। তাঁর অনেক বিহারী বন্ধু আছেন, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মিশ্রও আছেন একজন—কিন্তু মিশ্র উপাধিধারী কাউকে জামাই করতে মন সরে না। ব্রজেন্দ্রনাথ শিক্ষিত লোক, কিন্তু কুসংস্কারমুক্ত নন। তবু তিনি এদের দু'জনকেও চিঠি লিখলেন, কারণ যে দুটি ঘটনা ঘটল তাতে বিচলিত হ'য়ে পড়লেন তিনি।

প্রথম ঘটনাটির অনুরূপ ঘটনা প্রায়ই আজকাল ঘটছে। কিন্তু

এটি তাঁর বন্ধুর মেয়ের সম্পর্কে ব'লে তিনি একটু বেশী বিচলিত হলেন, হঠাৎ কে যেন তাঁর পিঠে একটা চাবুক মারল। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেপাল চাটুজ্যের মেয়ে এক বৈদ্য ছোকরার সঙ্গে পালিয়েছে। মেয়েটি আই. এ. পড়ছিল। যার সঙ্গে পালিয়েছে সে নন্-ম্যাট্রিক।

দ্বিতীয় ঘটনাটি মর্মান্তিক নয়, সামাজিক দিক থেকে ভালোই, কিন্তু তবু ব্রজেন্দ্রনাথের মনকে তা নাড়া দিল। উষা একদিন কলেজ থেকে এসে বললে—"বাবা, নমিতার বিয়ের ঠিক হয়েছে। খুব সুন্দর ছেলে, এরোপ্লেনের গ্রাউণ্ড ইন্‌জিনিয়ার।" উষার চোখে মুখে যদিও হাসি ফুটে উঠেছিল তবু তার পিছনে এমন একটা কি ছিল যা দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যথিত হলেন মনে মনে।

হরমোহিনীকে না জানিয়েই তিনি মিশ্র এবং চক্রবর্তী পাত্রদের উদ্দেশে চিঠি লিখে দিলেন।

সাত

ইন্‌জিনিয়ার কমলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতার নামও কে. কে. বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরা নাম কুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঁটে রোগা এবং খেঁকুরে প্রকৃতির লোক। ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী। কোন এক সাপ্লাই আপিসের ক্ষমতাবান অফিসার ছিলেন, সম্প্রতি রিটায়ার করেছেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁর। তিনটি ছেলে, সাতটি মেয়ে। ছেলে তিনটির মধ্যে কমলকিশোরই ভালো এবং পুত্রদের মধ্যে কনিষ্ঠ। বড় ছেলে পুষ্পকিশোর থিয়েটার-বিলাসী, পাড়ার শখের থিয়েটারের পাণ্ডাগিরি করে। শিশির ভাদুড়ীর নিখুঁত নকল করে রসিকমহলে নাম কিনেছে। বি. এ. পর্যন্ত পড়েছিল, পাস করতে পারে নি। দ্বিতীয় পুত্র পদ্মকিশোরের

বিদ্যা ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত। তার প্রধান কাজ রকে বসে' আড্ডা মারা এবং বাড়ির ফাইফরমাশ খাটা। সমস্ত রাজনৈতিক নেতা এবং সিনেমা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তার জ্ঞান প্রগাঢ়। পাড়ার লোকের সন্দেহ তার নাকি হাতটানও আছে। কুন্দকিশোরবাবুরও সুনাম নেই। খুব ঘুষ নিতেন নাকি, কলাটা মুলোটাও ছাড়তেন না। মাইনে খুব বেশী ছিল না। মাইনের উপরই নির্ভর করে থাকলে তিনি পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিতেও পারতেন না, কমলকিশোরকে উচ্চশিক্ষাও দিতে পারতেন না। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনটি ছেলের বিয়ে দিয়ে যে অর্থ পাবেন তাতেই মেয়ে দুটির বিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর হিসাবে একটু গোলমাল হ'য়ে গেল। বড় ছেলে বিয়ে করতে চাইছে না, আর মেজ ছেলের ভালো সম্বন্ধও আসছে না। যা আসছে তা থেঁদি বুঁচি গোছের কুৎসিত মেয়ের দল আর তাদের অতিদরিদ্র পিতাদের মিনতিপূর্ণ চিঠি। কুন্দকিশোর বিরক্ত হ'য়ে শেষে ঠিক করেছেন যে ছোট ছেলের বিয়েই আগে দেবেন। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে তিনি খুশী হলেন। কারণ সুন্দর গেঞ্জি মিলের নাম দেশের সকলেই জানে। ব্রজেন্দ্রনাথও স্বনামধন্য পুরুষ। এঁর সঙ্গে সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় মনে করে' তিনি নিম্নলিখিত চিঠিটি লিখলেন। বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ ছিল না, এর জন্যে নূতন একটি প্যাডও কিনলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল অমন একটি লোককে যা-তা কাগজে চিঠি লেখা ঠিক নয়।

নমস্কারান্তে নিবেদন,

মহাশয়, আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার পুত্র ইন্‌জিনিয়ার বটে। যে চাকুরি করিতেছে যদিও তাহা এখনও

পাকা হয় নাই, কিন্তু পাকা হইবার ষোল-আনা আশা রাখি। তাহার বর্তমান বেতন পাঁচশত পঁচাত্তর টাকা। ইহার মধ্যে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সও আছে। আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপিত হইলে অতিশয় আনন্দিত হইব। আপনি কন্যার পিতা, আপনার মনোভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি। কারণ আমিও কন্যার পিতা। আমার সাত কন্যা। পাঁচটির বিবাহ দিয়াছি, দুইটি এখনও অবিবাহিতা। কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সুতরাং আয়ের পথ বন্ধ। কি করিয়া যে কন্যা দুইটিকে পার করিব তাহাই ভাবিতেছি। আপনার কি কোনও বিবাহযোগ্য পুত্র আছে? যদি পরিবর্তনে সম্মত থাকেন, আপত্তি করিব না। আপনি জানিতে চাহিয়াছেন আমার বাড়িঘর আছে কিনা। খুলনা জেলায় বাড়িঘর ছিল, সেখানে এখন মুসলমানেরা বসবাস করিতেছে। অনেক লেখালেখি করিয়াও পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট হইতে আমার বাড়ির ন্যায্য মূল্য আদায় করিতে পারি নাই। কলিকাতায় ভাড়া বাড়িতে বাস করি। কিন্তু আমার ছেলে যখন ইন্‌জিনিয়ার তখন মনে হয় এইবার বোধহয় কোথাও মাথা গুঁজিবার মতো বাড়ি একটা হইবে। নিউ আলিপুর অঞ্চলে একটা জমির চেষ্টায় আছি।

এইবার আমার ছেলেদের কথা বলি। আমার তিন ছেলে। ইন্‌জিনিয়ার পুত্রটি সব চেয়ে ছোট। বড়ো দুইটির বিবাহ হয় নাই। তাহারা বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। আজকালকার ছেলেরা এ বিষয়ে বড়ই অবাধ্য। তাই অগত্যা ছোট ছেলেরই আগে বিবাহ দিতেছি। আপনি যদি পরিবর্তনে সম্মত থাকেন—জানি না আপনার বিবাহযোগ্য পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র আছে কি না—তাহা হইলে সব দিক দিয়াই সুরাহা হয়। আপনার কন্যার

ঠিকুজি এবং ফোটো পাঠাইয়া দিবেন। ঠিকুজির মিল হইলে এবং ফোটো দেখিয়া কন্যা পছন্দ হইলে মেয়েকে সামনাসামনি একবার দেখিব। ফোটো দেখিয়া অনেক সময় ঠিক ধারণা করা যায় না। অন্যান্য কথাবার্তাও তাহার পর হইবে। আমার সাদর নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকুন্দকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি পড়ে হরমোহিনীকে ডাকলেন—"ওগো শুনছ, চিঠি এসেছে—"

হরমোহিনী পাশের ঘরে ছিলেন, হন্তদন্ত হ'য়ে বেরিয়ে এলেন।

"কার চিঠি, বরেনের ?"

কয়েকদিন বরেনের চিঠি না পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছেন হরমোহিনী। তাঁর ইচ্ছা তাঁর প্রত্যেক ছেলে তাঁকে রোজ চিঠি লিখুক। ছেলেরা না লিখলে বউরা লিখুক। কিন্তু কেউ লেখে না, লেখা সম্ভবই নয়। কিন্তু হরমোহিনীর মাতৃ-হৃদয় কোনও যুক্তির তোয়াক্কা করে না। দু'দিন চিঠি না পেলেই তাঁর মনে হয় নিশ্চয় কারও অসুখ করেছে, কিংবা অন্য কোন বিপদ হয়েছে। আরও মুশকিল, তিনি একজন স্বপ্ন-এক্স্পার্ট। চোখটি বুজলেই স্বপ্ন দেখেন। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন। ঘুম ভেঙেই তাঁর মনে হয় মা মঙ্গলচণ্ডী স্বপ্নদূত পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান করছেন। গতকল্য তিনি যে স্বপ্নটি দেখেছেন তা ভয়ানক, একটা মরা জানোয়ারকে শকুনিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। সেই থেকে তাঁর মনে আর স্বস্তি নেই। নরেন আর হরেনের চিঠি এসেছে। কিন্তু বরেনের চিঠি অনেকদিন পান নি। হরমোহিনীর শাস্ত্রে শকুনের স্বপ্ন অত্যন্ত খারাপ, নিশ্চয়ই কোথাও কোনও অমঙ্গল হয়েছে, কিংবা হবে।

"না, বরেনের চিঠি আসে নি—"

"আসে নি? বরেন না হয় ডাক্তার মানুষ, রুগীটুগি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, শিউলি কি একলাইন চিঠি লিখতে পারে না? সমস্ত দিন করে কি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। ইতিপূর্বে বহুবার তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁর কাছে ঘন-ঘন চিঠি পাওয়াটা প্রয়োজন হ'তে পারে কিন্তু ওদের পক্ষে ঘনঘন চিঠি লেখাটা তেমন প্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনটা যেখানে একতরফা সেখানে এরকম অসঙ্গতি মাঝে মাঝে ঘটবেই। এসব বিষয়ে অশিক্ষিতদের মনোভাবটাই ভালো মনে করেন তিনি। ওরা প্রবাসী আত্মীয়স্বজনদের চিঠি প্রায় পায় না, না পেলে চিন্তিতও হয় না, বরং চিঠি এলে শঙ্কিত হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ চিঠি এল কেন? নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ আছে! এসব কথা হরমোহিনীকে অনেকবার বলেছেন তিনি, কোনও ফল হয় নি। এখন আর ও নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে প্রবৃত্তি হ'ল না তাঁর।

"বরেনের চিঠি কাল বা পরশু আসবে। তার চেয়েও দরকারী চিঠি এসেছে একটা—তোমার সেই বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির বাবার চিঠি—"

চিঠিটি পড়ে শোনালেন। তারপর নিজের মনের ভাব চেপে রেখে বললেন, "পাত্রটিকে তো ভালোই মনে হচ্ছে। ঠিকুজি আর ফোটো পাঠিয়ে দেব? উষার ভালো ফোটো আছে কি?"

এইবার হরমোহিনী বোমার মতো ফেটে পড়লেন।

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওই পাত্রের সঙ্গে উষার বিয়ে দেবে? সাত-সাতটা ননদের আর দু'দুটো দুমদো আইবুড়ো ভাশুরের ধাক্কা সামলাতে পারবে তোমার মেয়ে? তাছাড়া ঘরবাড়িও

নেই। ওই ছোট ছেলেটিই সম্বল। ওকে ভাঙিয়েই আইবুড়ো মেয়ে দুটো পার করবে। ওখানে আমি উষার বিয়ে দেব না—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরেরই এই অবস্থা। ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।"

"তা যাক্। তবু ঠগের হাতে মেয়ে দিতে পারব না।"

আট

হরিহর মিশ্র লোকটিও হিসাবী। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি হিসাব করে' জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বোর্ডিংএ মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে মাত্র পাঁচ টাকা হাত-খরচ দিতেন। এই পাঁচ টাকার মধ্যেই সব রকম করতেন তিনি। সিনেমা দেখতেন, থিয়েটার দেখতেন, চপ কাটলেট খেতেন, ভীম নাগের সন্দেশেরও রসাস্বাদন করতে ছাড়তেন না। কিন্তু এগুলি করতেন মাসে একবার করে। বাকী দিনগুলি কাটাতেন ছোলা ভিজে বা মুড়ি খেয়ে। সেকালে সস্তা-গণ্ডার দিন ছিল বলে পাঁচ টাকাতেই কুলিয়ে যেত। ওভারশিয়ার হয়েছিলেন। অনেক কাঁচা পয়সা রোজগার করেছেন, কিন্তু বাড়াবাড়ি রকম বেসামাল হন নি কখনও। মদ খেয়েছেন, কিন্তু প্রায়ই পরের পয়সায় এবং লোভের মুখে রাশ টেনে। নারী-মাংসের লোভেও বেপাড়ায় যে মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করেন নি তা নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন। পা পিছলে পড়ে' গিয়ে কেলেঙ্কারি করেন নি কখনও। তুখোড় ছেলে, চৌকোশ মাল এই সব নামে বন্ধুমহলে খ্যাত ছিলেন। বেশ মোটা পণ নিয়ে বিয়ে করেছিলেন। পণের দিকটা ভারী ছিল বলে বধূর দিকটা হালকা হ'য়ে গিয়েছিল। হরিহর-পত্নী ছিলেন কালো, রোগা এবং কুশ্রী।

মুখের মধ্যে চোখ ছুটিই ছিল আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল। যক্ষ্মারোগের এটি একটি লক্ষণ নাকি। বিয়ের আগে মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল। জ্বরও হচ্ছিল রোজ। টাকার জোরে কন্যার পিতা এই মেয়েকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন হরিহর মিশ্রের ঘাড়ে। টাকার লোভে অন্ধ হ'য়ে হিসাবী হরিহরও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে' এই বেহিসাবী কাজটি করে' ফেললেন। এই পত্নীর গর্ভে তাঁর একটি মাত্র পুত্রের জন্ম হয়। তার জন্ম দেবার পর হরিহরের স্ত্রী আর বাঁচেন নি। এক স্যানাটোরিয়মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন তিনি।

হরিহরও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখেন নি। শ্বশুরের তিনি নামকরণ করেছিলেন 'জোচ্চোর'। নবজাত শিশুটিকে তাঁর শ্বশুর নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হরিহর দেন নি। নিজেই মানুষ করেছিলেন তাকে এক 'ওয়েট্ নার্স'-এর সাহায্যে। ওয়েট্ নার্স মেম নয়, বাঙালীও নয়, এক বিহারবাসিনী কাহারনী। মেয়েটি ওভারশিয়ার হরিহরের অধীনে একদা মজুরনীর কাজ করত। তার স্বামী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ওকে একদিন ফেলে পালায়। পালাবার দিনকতক পরে ছেলে হয় ওর একটি। ছেলেটিও বাঁচে নি। এই সময় হরিহর ওর কোলে তাঁর শিশুপুত্র জলধরকে তুলে দেন। সেই থেকে ওর নূতন নামকরণ হ'ল জলধরের মা। এই জলধরের মা-ই এখন হরিহরের গৃহের কর্ত্রী। হরিহরের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ঠিক কতটা ঘনিষ্ঠ তা বাইরে থেকে নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু এ কথাটা মানতেই হবে হরিহর তাঁর কর্তব্য থেকে একচুলও নড়েন নি। প্রাণ দিয়ে ছেলেটিকে মানুষ করেছিলেন। বরাবরই তিনি হিসাবী লোক। ছেলেটির শৈশব থেকেই তার জন্য টাকা জমাবার নানারকম ব্যবস্থা করতে ভোলেন নি। Fixed deposit, সেভিংস ব্যাঙ্ক, পোস্টাল সার্টিফিকেট, ইন্‌সিওরেন্স এসব তো করেইছিলেন, ছেলের নামে লটারির

টিকিটও কিনতেন প্রায়ই। একটা লটারিতে মোটা রকম টাকাও পেয়েছিলেন। তাঁর নিজের জীবন অর্থাভাবের মধ্যে কেটেছিল, টাকার অভাবেই তিনি ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে পান নি। সেইজন্য তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল জলধর যেন কখনও এ কৃচ্ছ্রতার কবলে না পড়ে। স্কুলজীবন থেকেই ভালো গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন জলধরের জন্য। বাইরে গৃহশিক্ষক তাকে পড়াত আর ভিতরে ওই অশিক্ষিতা কাহারনী বসে বসে উৎকর্ণ হ'য়ে শুনত ঠিকমতো পড়ানো হচ্ছে কি না।

জলধরের মা না থাকলে জলধর হয়তো মানুষ হ'ত না। তার নিজের মা বেঁচে থাকলে তার জন্য এতটা করত কিনা সন্দেহ।

একদিন কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পড়ল। জলধর তখন ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে সবে ঢুকেছে, মুখ দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত উঠল তার। হরিহর আর কালবিলম্ব করলেন না, তাকে নিয়ে সোজা সুইট্‌জারল্যাণ্ড চলে' গেলেন। জলধরের মা-ও সঙ্গে গেল। জলের মতো টাকা খরচ হ'ল, কিন্তু সেরে গেল জলধর। হরিহর তাকে আর এদেশে নিয়ে এলেন না, লণ্ডনেই সে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে লাগল। হরিহর দেশে ফিরে এলেন জলধরের মাকে নিয়ে। দেশে ফিরে এক বছর পরে জলধরের মা পড়ল অসুখে। ডাক্তাররা সন্দেহ করতে লাগলেন তারও যক্ষ্মা হয়েছে। কিছুদিন পরেই মারা গেল সে। তাকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার মতো আর টাকা ছিল না হরিহরের।

যথাসময়ে জলধর বিলেত থেকে ইন্‌জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এল। বড় চাকরিও পেল একটা। এর পর হরিহর বিয়ে দেবার আয়োজন করতে লাগলেন ছেলের। হিসাব করে' এবং সব দিক বাঁচিয়েই আয়োজন করলেন।

প্রথমতঃ সুইট্জারল্যাণ্ডের সেই ডাক্তারকে চিঠি লিখলেন যে জলধরের এখন বিয়ে দেওয়া যেতে পারে কি না। তার শরীরে রোগের আর কোন লক্ষণ নেই, ওজন কমে নি, বরং বেড়েছে। ডাক্তার মত দিলেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারেরও অভিমত নিলেন তিনি। তাঁরাও আপত্তি করলেন না।

এর পর তিনি শরণাপন্ন হলেন জ্যোতিষীর। তারা বললে ছেলে আপনার দীর্ঘায়ু নয়। কিন্তু ওর যদি এমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন যার পতির দীর্ঘায়ুযোগ আছে অর্থাৎ যার সপ্তম, চতুর্থ স্থান এবং চন্দ্র শুক্র খুব ভালো তাহলে ভয় নেই।

জলধর বিয়ে করতে চায় নি, কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত মত দিতে হ'ল যখন হরিহর বললেন, তুমি আমার একমাত্র পুত্র। তুমি যদি বিয়ে না কর তাহলে আমার বংশলোপ হ'য়ে যাবে।

জলধর উত্তর দিলে—বেশ, তাহলে করব। কিন্তু একটি শর্ত আছে—আমার যে অসুখ করেছিল তার বিবরণ কন্যাপক্ষদের আগে জানাতে হবে। অসুখের খবর লুকিয়ে আমি বিয়ে করতে পারব না।

হরিহরও এতে রাজী হলেন। তিনি জানতেন দু'চারজন মেয়ের বাপ হয়তো এ খবর পেয়ে পেছিয়ে যাবে, কিন্তু যে দেশে মৃত্যুপথযাত্রী স্থবিরের গলাতেও বধূরা মালা দেয়, যে দেশে টাকার লোভে যে কোনও পাষণ্ডকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয় মেয়েরা, সে দেশে জলধরের মতো পাত্রের জন্য মেয়ের অভাব হবে না।

হরিহরকে পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপনও দিতে হয় নি। খবরটা মুখে মুখে চাউর হ'য়ে পড়াতেই অনেক পাত্রীর খবর পেয়ে গেলেন তিনি। সব মেয়ের বাপকেই এক উত্তর দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথও যথাসময়ে উত্তর পেলেন।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেলাম। এ বিষয়ে অগ্রসর হবার আগে প্রথমেই আপনাকে একটি কথা জানাতে চাই। আমার ছেলের দশ বছর আগে যক্ষ্মা হয়েছিল। তাকে আমি সুইট্জারল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সেখানকার ডাক্তাররা এবং এদেশের বড় বড় ডাক্তাররা বলেছেন যে ও এখন স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে, কোন বাধা নেই। এ খবর জেনেও আপনি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপনার মেয়ের জন্ম-তারিখ, জন্মসময় এবং ঠিকুজি থাকলে ঠিকুজিও পাঠাবেন। মেয়ের ঠিকুজি যদি আমার জ্যোতিষীর মনোমত হয় তবেই আমি এ বিষয়ে অগ্রসর হব। আমার নমস্কার জানবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীহরিহর মিশ্র।

চিঠিটা পড়ে' ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, বোগাস্। হরিহরের জীবনবৃত্তান্ত জানলে হয়তো একথা বলতেন না। হরিহর যে কৃতী পুরুষ তার একটা প্রমাণ কিন্তু পেলেন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে। আমাদের সমাজে কৃতী পুরুষদেরই শত্রু থাকে, বাঘের পিছনে যেমন ফেউ। হরিহরবাবুর চিঠি পাওয়ার দিন দুই পরেই আর একটি চিঠি এল। চিঠির উপরে লেখা—

কন্ফিডেন্শ্যাল।

প্রিয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আমি আপনার জনৈক হিতৈষী বলিয়া আপনাকে এই পত্র দিতেছি। শুনিলাম আপনার কন্যার সহিত হরিহরবাবুর

ইন্‌জিনিয়ার পুত্র জলধরের বিবাহের কথা আপনি পাড়িয়াছেন। মহাশয়, কদাচ ওখানে বিবাহ দিবেন না। ছেলেটি তাঁহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে জন্মে নাই। তাহার জন্ম হইয়াছে এক ছোটলোক মজুরনীর গর্ভে। ইহা ছাড়া আরও গোল আছে, ছেলেটি যক্ষ্মারোগী। এ বিষয়ে তৃতীয় সংবাদটি দিয়া পত্র শেষ করিব। হরিহর লোকটি চামার, পয়সা-পিশাচ। আপনার জ্ঞাতার্থে এবং হিতার্থে এই পত্র লিখিলাম। নমস্কার জানিবেন। আশা করি কুশলে আছেন। ইতি—

আপনার জনৈক হিতৈষী বন্ধু।

এই চিঠি পড়ে' ব্রজেন্দ্রনাথের বাঙালী-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আর একটু বাড়ল। কিছুদিন আগে তাঁর বাগান থেকে ফুলগাছ চুরি করেছিল বাঙালী কয়েকটা ছোঁড়া। তারাই যে নিয়েছে এ হদিসও দিয়েছিল আর একদল বাঙালী ছোঁড়া। সে-সময় সাধারণ নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালীর নীচতার কিছু পরিচয় পেয়েছিলেন। আজ আবার নতুন রকম আর একটা পেলেন।

হরমোহিনীকে এ দুটি চিঠির কথা আর জানালেন না তিনি। বরেনের চিঠি পেয়ে তাঁর মনের শান্তি ফিরে এসেছিল, সেটা আর বিঘ্নিত করতে ইচ্ছে হ'ল না তাঁর।

নয়

পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী খুবই আধুনিক-মনা লোক। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের নকল করে' আমাদের পূর্বপুরুষদের রীতি ইনি ত্যাগ করেছেন। নামের আগে 'শ্রী' লেখেন না। তাঁর বন্ধু গণেশ তাঁকে

জিজ্ঞাসা করেছিল, "পূর্বপুরুষদের শ্রী-কে বিদায় করে' দিলে কেন?" চক্রবর্তী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, "ওতে অহংকার প্রকাশ পায়। নিজেই নিজেকে শ্রীমান্ বলাটা অশোভন নয় কি!" গণেশও ছাড়বার পাত্র ছিল না, সে বললে, "তাহলে তোমার ওই পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী নামটাও বদলে ফেলা উচিত। তোমার পার্থ-বিক্রমও নেই, তুমি সত্যিকার চক্রবর্তীও নও। ও নাম বদলে তাহলে নিজের নাম রেখে দাও ছুঁচোর গোলাম চামচিকে—" চক্রবর্তীও হটবার লোক ছিলেন না। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "ওর আর একটা দিক আছে। আমাদের 'শ্রী'টা বিলিতী 'মিস্টার'এর অনুরূপ। নিজের নামে কেউ মিস্টার যোগ করে' লেখে না ইংরিজিতে।" গণেশ উত্তর দিয়েছিল, "তুমি ভুলে যাচ্ছ ভায়া ইংরিজি মিস্টার সৃষ্টি হবার ঢের আগে আমাদের 'শ্রী' মূর্তিমতী হয়েছেন, শুধু আমাদের নামের গোড়ায় নয়, আমাদের লক্ষ্মীতে, আমাদের সরস্বতীতে, আমাদের সারাজীবনে। শ্রীকে বাদ দিয়ে দিলে আমাদের সভ্যতার অনেকখানিই বাদ দিতে হয়।"

তর্ক আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। পার্থ-বিক্রম অবশ্য গণেশের কথায় নিজের নামের গোড়ায় আর শ্রী যোগ করেন নি। কারণ তিনি আধুনিক। তিনি জানেন এ যুগে আধুনিকতার ছাপ না থাকলে কোনও আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁর যৌবনকাল থেকেই আধুনিক সমাজে কলকে পাওয়ার জন্য সমুৎসুক। আধুনিক কথাটা অবশ্য আমি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করছি যার নির্গলিতার্থ সাহেবিয়ানার নকল করা। পার্থ-বিক্রম বাইরে স্যুট এবং বাড়িতে ঝোলা পা-জামা পরেন, চাকরকে 'বয়' বলে' ডাকেন, সাহেবী খানা খান সাহেবী কেতায়, বাড়িতে রান্না করে বাবুর্চি, গৃহিণী বা মৈথিল ঠাকুর নয়। গৃহিণী আর কন্যা বেড়িয়ে বেড়ান

সভায় সভায়, পার্টিতে পার্টিতে, তাঁদের ফোটো কাগজে বেরোয়, তাঁদের গানের নাচের এবং শিল্পবোধের তারিফ করেন পাইপ-কামড়ে-ধরা মুখে প্রৌঢ় রসিকরা। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হ'লে পার্থ-বিক্রম নমস্কার করেন না, বলে' ওঠেন 'হ্যালো', যখন তাঁরা বিদায় নেন তখনও প্রণাম বা নমস্কার করেন না, বাঁ হাতটা ঈষৎ উত্তোলন করে' বলেন, 'টা টা বাই বাই'। মেয়ের নাম 'জিপ্‌সি'। ছেলের নাম চাকু, এটা চক্রবর্তীরই অপভ্রংশ বোধহয়। ওরা সবাই সোসাইটি ক্রিচার। আমোদের স্রোতে ভাসতে চায় কিন্তু নাকানিচোবানি খায় আন্তরিকতাহীন ন্যাকামির আবর্তে। তা খাক, ওতেই ওরা খুশী।

পার্থ-বিক্রম বহুকাল আগে বিলেত গিয়েছিলেন শ্বশুরের টাকায় এবং সেই সময় আলাপ হয়েছিল সেই সব লোকেদের সঙ্গে যাঁরা আজকাল ভারত-ভাগ্য-বিধাতা। ভারত-ভাগ্য-বিধাতারা অনেক বিষয়েই নিষ্প্রভ কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব প্রীতির জলুসটা চোখ-ধাঁধানো। তাই এই স্বাধীনতার বাজারে পার্থ-বিক্রমের সুবিধা হয়েছে অনেক। যদিও তিনি খবরের কাগজের ফ্রণ্ট-পেজ-বিহারী হোমরাচোমরা নন, কিন্তু নেপথ্যে থেকেও তিনি যা গুছিয়ে নিয়েছেন তা-ও নিন্দনীয় নয়। বিলেত থেকে যে ব্যারিস্টারি ডিগ্রিটা এনেছিলেন (ঠিক এনেছিলেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে অনেকের) সেটা কিন্তু কাজে লাগে নি। পারমিটের নৌকা বেয়েই তিনি ঐশ্বর্যের যে সমুদ্রে পৌঁছতে পেরেছেন তা অগাধ। তাঁর বিশ্বাস আচারে-ব্যবহারে চোস্ত আধুনিকতাই তাঁর উন্নতির কারণ।

তিনি প্রায় খোলাখুলিই বলেন যে গান্ধীজীর নীতি এবং উপদেশ এ যুগে অচল। তা যদি তিনি অনুসরণ করতেন—যা কিছুকাল তিনি করবার চেষ্টা করেছিলেন এবং এখনও দরকার পড়লে যা তিনি থিয়েটারে অভিনয় করার মতো মাঝে মাঝে করেন—তাহলে বড়জোর

একটা আশ্রম করতে পারতেন কিংবা কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি পদ অলংকৃত করতেন। তিনি আজ যে ধনকুবের হয়েছেন তা স্বপ্নেরও অতীত থেকে যেত তাঁর কাছে। আর কালো-বাজারই তাঁর জীবনে আলো এনেছে। এই কালোবাজারে তাঁর হাতের টর্চ হয়েছেন হোমরাচোমরা গভর্নমেণ্ট অফিসাররাই এবং তাঁর ধারণা নিখুঁত আধুনিকতার ফাঁদেই এই সব অফিসাররা ধরা পড়েছিলেন। ঘুষের জোরে সবটা হয় নি।

জিপ্‌সি অনেককে আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রৌঢ়া স্ত্রীর অমায়িকতা, অভিনয়-কুশলতা এবং প্রসাধন-পটুতাও কম সাহায্য করে নি। এঁরা যদি পর্দানশীন হতেন বা সাধারণ গৃহস্থ মেয়েদের মতো অনগ্রসর হতেন তাহলে হয়তো পার্থ-বিক্রম যা হয়েছেন তা হ'তে পারতেন না। বর্তমানে তাঁর প্রভাব বিরাট অক্টোপাসের মতো, বহু লোকের এবং বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। এঁর ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সে যে রাজরানী হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ছেলেটির নিজের যোগ্যতাও কম নয়, সে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং জার্মানি—এই তিন দেশে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ে' ভালো ডিগ্রি এনেছে। ইচ্ছে করলেই সে খুব বড় চাকরি পেতে পারত, কিন্তু চাকরি করার রুচি তার নেই। সে ব্যবসা করতে চায়। ছেলেটির আর একটি বৈশিষ্ট্যও বিব্রত করেছে আধুনিকতা বাতিকগ্রস্ত পার্থ-বিক্রমকে। সে স্পষ্ট ভাষায় বলে' দিয়েছে বিলাতী প্রথায় কোর্টশিপ করে' সে বিয়ে করবার পক্ষপাতী নয়, সে চিরাচরিত হিন্দু প্রথায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে পিতামাতার নির্বাচিত মেয়েকেই বিয়ে করবে। সে যদি মার্কিন, লণ্ডনী বা জার্মান বউ ঘরে আনত পার্থ-বিক্রম বিচলিত হতেন না, সে যদি পারসী কোটিপতি অমুকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাইত সে ব্যবস্থাও তিনি অনায়াসে করতে পারতেন।

তাঁর মেয়ে জিপ্সি অনেকের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে শেষে এখন ঠিক কবেছে এক লক্ষপতি সিদ্ধি বিড়িব্যবসায়ীর গলায় মালা দেবে— পার্থ-বিক্রম আপত্তি করেন নি। কিন্তু চাকুর প্রস্তাব শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। তাঁর অমন হীরের টুকরো ছেলেব উপযুক্ত সহধর্মিণী কি তিনি পচা পুরোনো এঁদো ঘুণ-ধরা হিন্দুসমাজে খুঁজে পাবেন? বক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ওর উপযুক্ত মেয়ে আছে কি! সত্যিই তিনি বড় বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন। যদিও তিনি আধুনিকতার উপাসক তবু তাঁর মনেব প্রত্যন্ত প্রদেশে সেকেলে কর্তার ভূত বেঁচে ছিল একটা, পিতৃ-অধিকাবেব দাবি জানিয়ে সে বলতে চাইছিল, আধুনিক যুগে আধুনিক কায়দায় চলতে হবে তোমাকে এই আমার ইচ্ছা এবং আদেশ।

কিন্তু স্বল্পবাক তীক্ষ্ণ নাক তিন-তিনটে বিলিতী ডিগ্রিওলা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তিনি তাঁর ইচ্ছা বা আদেশ কোনটাই জাহির করতে পাবলেন না। এ-ও তাঁর মনে হ'ল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই যখন আধুনিকতার বীজ-মন্ত্র তখন ছেলেব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সম্মান না করলে হয়তো তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা তাঁর মনে জাগল না। নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাহির করে' যদি তিনি বলতে পারতেন, তোমার জন্যে ঐ পচা হিন্দুসমাজে আমি মেয়ে খুঁজতে পাবব না, তুমি নিজেই খুঁজে নাও গিয়ে—তাহলে সেটা তাঁর তথাকথিত আধুনিক মনোভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে যেত, কিন্তু তা তিনি পারলেন না।

আসল কথা ছেলেকে তিনি ভয় পান, মেয়েকেও। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস তাঁর নেই। তাই আধুনিকতা-বিরোধী এই ভীরুতাকে তিনি নিজের কাছেই আমোল দিলেন না শেষ পর্যন্ত। অসুবিধাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে সারাজীবন যা

করেছেন এবার তাই করে' ফেললেন, মুখোশ পরে' ফেললেন একটা। সোৎসাহে বন্ধুমহলে বলে' বেড়াতে লাগলেন—চাকুই হচ্ছে মনে-প্রাণে স্বদেশী, এত দেশ ঘুরে এলো, কিন্তু গায়ে আঁচড়টি লাগে নি, বুঝলে। ওর জন্যে একটি খাঁটি দেশী মেয়ে খুঁজে বার করতে হবে। শুনলে বিশ্বাস করবে না, ও এখনও খেতে বসে' গণ্ডূষ করে! কোনদিন হয়তো টিকি রেখে বসবে—আই শাণ্ট বি সারপ্রাইজ্ড্। ওর মনের মতো একটি পাত্রী খুঁজতে হবে। ভেবেছিলেন পাত্রীর জন্যে বিজ্ঞাপন দেবেন একটা। কিন্তু তার দরকার হ'ল না। মুখে মুখেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ফলে এত চিঠি আসতে লাগল যে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন পার্থ-বিক্রম। প্রত্যেক লোকের সঙ্গে পত্রালাপ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। তাই তিনি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায় বার করে' ফেললেন একটা। হাজারখানেক চিঠি আর হাজারখানেক ফর্ম ছাপিয়ে ফেললেন। চিঠিটি নিম্নলিখিতরূপ :

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেয়েছি। একটি ফর্ম পাঠাচ্ছি। সেটি ভরে' পাঠাবেন। যদি এক মাসের মধ্যে উত্তর না পান জানবেন, আপনার আবেদন গ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

ভবদীয়
পার্থ-বিক্রম চক্রবর্তী।

প্রথম কয়েকখানা চিঠিতে নিজে হাতেই সই করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ও আর পেরে উঠলেন না, নিজের সইয়ের রবার-স্ট্যাম্প করিয়ে নিলেন একটা।

ফর্মটি নিম্নলিখিতরূপ—

(১) পাত্রীর নাম

(২) পাত্রীর পিতামাতার নাম

(৩) পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের পরিচয়

(৪) পাত্রীর বয়স

(৫) পাত্রীর লেখাপড়ার বিবরণ—স্কুল ও কলেজের নামে।

(৬) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌গুলিতে পারদর্শিতা আছে—

(ক) কণ্ঠসংগীত (খ) বাদ্যযন্ত্র (গ) রন্ধন (ঘ) চিত্রাঙ্কন (ঙ) নৃত্য (চ) সেলাইয়ের কাজ (ছ) বাতিকের কাজ (জ) উল বোনা (ঝ) আলপনা দেওয়া (ঞ) চামড়ার কাজ।

(৭) পাত্রীর গায়ের বর্ণ কিরূপ

(৮) পাত্রীর উচ্চতা কত

(৯) পাত্রীর কোমরের ও বুকের মাপ কত (ফিতা দিয়া মাপিয়া পাঠাইতে হইবে)

(১০) মাথার চুলের ঘনত্ব এবং দৈর্ঘ্য কত, চুলের ডগা কিরূপ

(১১) ওজন কত

(১২) স্বাস্থ্য কেমন? ইতিপূর্বে কি কি রোগে ভুগিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(১৩) পা পাতিলে পায়ের নীচে ফাঁক থাকে কি না

(১৪) দাঁত কেমন

(১৫) টেনিস, ব্যাডমিন্টন বা অন্য কোন আউটডোর খেলায় দক্ষতা আছে কি না

(১৬) টিকিট সংগ্রহ, অটোগ্রাফ সংগ্রহ বা ওই জাতীয় কোন

বাত্তিক আছে কি ? পাত্রীর যদি কোন 'হবি' (hobby) থাকে এখানে তাহা বিবৃত করুন।

এই ফর্মটির সঙ্গে নিম্নলিখিত জিনিসগুলিও পাঠাইতে হইবে।

(ক) দুইটি ফোটো :—একটি ফ্রন্ট ফেস, আর একটি প্রোফিল।

(খ) পাত্রীর ঠিকুজি।

(গ) সম্ভব হইলে একজন রেজিস্টার্ড অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের সার্টিফিকেট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বিবাহে যাহা খরচ করিতে পারিবেন তাহার পরিমাণ জানাইবেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ এতটা প্রত্যাশা করেন নি। বিস্মিত এবং ঈষৎ আতঙ্কিত হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি ওই ছাপা চিঠি এবং ফর্মের দিকে। বাঙালীদের যে এত দ্রুত অধঃপতন হয়েছে তা তিনি ভাবতে পারেন নি। একবার তাঁর মনে হ'ল তাঁর 'কিউরিও'-সংগ্রহের মধ্যে ওগুলো রেখে দেবেন, কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণা হ'ল। কুচি কুচি করে' ছিঁড়ে ফেললেন চিঠি দুটো। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, সেগুলোকে একত্রিত করে' পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর ভিতরে গিয়ে বাথরুমে ঢুকে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেন।

ব্রজেন্দ্রনাথকে অসময়ে বাথরুম থেকে বেরুতে দেখে হরমোহিনী বললেন, "হঠাৎ বাথরুমে গেছলে যে ? পেট ভালো আছে তো ? যখন খেতে আরম্ভ কর তখন তো আর জ্ঞান থাকে না—"

"সাবান দিয়ে হাতটা ধুতে গিয়েছিলাম—"

"হঠাৎ সাবান দিয়ে হাত-ধোওয়া কেন ?"

"এমনি—"

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীর কাছে আর কথাটা ভাঙলেন না।

ভাঙলে আর এক চোট বকুনি খেতে হ'ত। হরমোহিনী ওই চক্রবর্তী পাত্রকে গোড়াতেই নাকচ করেছিলেন।

দশ

এই যখন অবস্থা, তখন উষার খবর কি? সে কি কিছু ভাবছে না এ বিষয়ে? তার ভাবনার কিছু খবর পাওয়া যাবে তার এই চিঠিখানা থেকে। চিঠিখানা সে লিখেছিল তার এক বিবাহিতা বান্ধবীকে। ছ'মাস আগে তার বিয়ে হয়েছে।

ভাই সুজাতা,

অনেকদিন পরে তোর চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। তুই জানতে চেয়েছিস আমার বিয়ের কিছু ঠিক হয়েছে কি না। এখনও কিছু শুনি নি। বাবা অনেক জায়গায় চিঠি লিখছেন। অনেক পুকুরে ছিপ ফেলছেন, অনেক নদীতে জাল। কিন্তু কিছু উঠেছে বলে' এখনও শুনি নি। যে সব পাত্রের খবর মাঝে মাঝে শুনি তাদের অধিকাংশই বাজে বলে' মনে হয়। কিন্তু বাবা যদি ওই বাজে পাত্রের মধ্যে কাউকে নির্বাচন করেন, মুখটি বুজে বিয়ে করতে হবে। 'না' যে বলতে পারি না, তা নয়, কিন্তু বাবার মনে কষ্ট দিতে পারব না। যদি অমত করি বাবা তা অগ্রাহ্য করবেন না, এ বিশ্বাস আছে। কিন্তু বাবাকে বিব্রত করার ইচ্ছে নেই। তিনি যা করবেন, মেনে নেব।

এখানকার স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস শুক্লাদি আমাকে খুব ভালবাসেন, তিনি বলছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্কুলে একজন 'টিচার' নেবেন। আমি যদি বি. এ. পাস করতে পারি আর যদি

চাকরি নিতে রাজী থাকি তাহলে আমাকে তিনি কাজ দেবেন বললেন। মাকে কথাটা একবার বলেছিলাম, তাতে তিনি এমন ধমক দিয়েছেন যে দ্বিতীয়বার আর সে কথা পাড়তে সাহস করি নি। আর সত্যি কথা বলতে কি আমার ভাই চাকরি করতে ইচ্ছে করে না। শুক্লাদি, বেণুদি, সোনাদি এঁদের মুখ দেখলে মনে হয় না ওঁরা খুব সুখে আছেন। ওঁদের মুখে আনন্দের ছাপ নেই যেন। মনে হয় ওঁরা সবাই অসুখী, সকলেরই মনের ভিতর যেন অসন্তুষ্টির আগুন জ্বলছে।

কিন্তু তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তাতেও ভাই আমি ভয় পেয়ে গেছি। তুই অমন ভালো সেতার বাজাতিস, লিখেছিস এখন একবারও বাজাবার সময় পাস না। দিনরাত খালি সংসারের কাজ করতে হয়। তুই ওদের বাড়িতে যাবার আগে ওদের সংসার কি করে' চলত তাহলে? নিজের সংসারের কাজ করা যে খারাপ তা বলছি না (যদিও আমি নিজে খুব কুঁড়ে, গতবটি নাড়তে ইচ্ছে করে না), নিজের সংসারের কাজ করা তো উচিতই, স্বামী শ্বশুর-দেওর-ননদ এদের সেবা করাটাই তো আনন্দের—কিন্তু তাই বলে' দাসীবৃত্তিটা ভাল নয়। তুই তোর শ্বশুরবাড়ির কথা যা লিখেছিস তা পড়ে' কষ্ট হ'ল। পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের সমাজ-জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, তাই বাইরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও আমরা কিছুই পাই নি, আমরা সত্য কথা বলতে ভয় পাই, আনন্দলাভ করবার দাবি জানাতেও ভয় পাই। ঘরে-বাইরে সশঙ্কিত পশুর মতো রয়েছি, সামান্য একটু আনন্দের জন্যে, মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে অমানুষের মতো কি হীনতাই না সহ্য করতে হচ্ছে আমাদের!

মালতীর কথা মনে পড়ে? মাতাল স্বামীর যথেচ্ছাচারকে সহ্য করছে সে এখনও মুখ বুজে। এর মধ্যেই তিনটে মেয়ে হয়েছে তার। ক্রমাগত মেয়ে হচ্ছে বলে' তার শাশুড়ী তাকে কী যে গঞ্জনা দিত তা আর বলবার নয়। কিন্তু তা সহ্য করেও সে শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে ছিল, কারণ তার আশা ছিল স্বামী হয়তো একদিন ফিরে আসবে, হয়তো একদিন তার সুমতি হবে। কিন্তু তার সে আশাও ভেঙে গেছে, কারণ সে এখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছে যে তার স্বামী কেবল মাতাল নয়, চরিত্রহীনও। আর একটি মেয়েকে নিয়ে সে আছে। তাকে বিয়ে করে নি, তবু স্বামী-স্ত্রীর মতো আছে।

আমাদের দেশে একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে, কিন্তু নীতিহীনতার বিরুদ্ধে হয়েছে কি? যারা দুশ্চরিত্র বা দুশ্চরিত্রা তারা বিয়ের ফাঁদে পা দিতে যাবে কেন! সুতরাং আমাদের পক্ষে ও আইন ব্যর্থ। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কি জানিস? মালতী এখনও তার স্বামীর পা আঁকড়ে পড়ে' আছে। কি করবে, নিতান্ত নিরুপায় যে। আই. এ. পাস করেছিল, হয়তো কোথাও চাকরি জুটতে পারে, আমাকেই সে লিখেছিল আমাদের মিলে যদি কোন চাকরি যোগাড় করে' দিতে পারি বাবাকে বলে'। বাবাকে বলেছিলাম, বাবা বললেন —টাইপিস্ট করে' বাহাল করে' নিতে পারি, কিন্তু একশ' টাকার বেশী মাইনে দিতে পারব না। মালতী টাইপ করতে জানে না, যদি জানতও তাহলে মাত্র একশ' টাকায় তিন তিনটে মেয়ে নিয়ে ওর চলত কি? মেয়ে তিনটেকে ফেলে রেখে তো পালিয়ে আসতে পারে না। মালতীর বাবা খুব গরীব, তিনি ওর ভার নিতে অক্ষম। মালতীর এক দাদা কোথায় যেন কেরানীগিরি

করেন। মালতী তাঁকে চিঠি লিখেছিল, উত্তর পায় নি। এ অবস্থায় শ্বশুরবাড়ি আঁকড়ে পড়ে' থাকা ছাড়া ওর আর গতি কি। সেদিন এসেছিল আমার কাছে, দেখে বড় কষ্ট হ'ল।

ফন্তিকে মনে আছে তোর? সেই যে আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে' হঠাৎ বিয়ে হ'য়ে গেল যার। কি রূপ ছিল তার মনে আছে? কি রং, কি চুল, কি চোখ মুখ, রূপের জোরেই প্রায় বিনাপণে বিয়ে হয়েছিল। অনেকদিন পরে সেদিন দেখা হ'ল তার সঙ্গে। চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গেছে যে প্রথমে আমি চিনতেই পারি নি। সে রং নেই, চোখের কোলে কালসিটে পড়েছে, মাথার চুল উঠে গেছে, আর কি রোগা, একটা কঙ্কাল যেন। শুনলাম তার ছেলে বাঁচবে না। পেট থেকেই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। তার স্বামীর রোজগার ভালো, কিন্তু ফন্তির মনে সুখ নেই। এই সব দেখে শুনে বিয়ের কথা উঠলেই ভয় করে। জানি না অদৃষ্টে কি আছে। একটিমাত্র ভরসা বাবা ভাল করে' না দেখে শুনে বিয়ে দেবেন না। অনেক লম্বা চিঠি লিখে ফেললাম। যা মনে এল লিখে ফেললাম আবোলতাবোল। পড়ে' নিশ্চয়ই তুই হাসচিস? ভালবাসা নে। আবার অনুরোধ করছি সেতার বাজানো ছাড়িস নি। ইতি—

উষা।

এগার

সব জায়গাতেই হতাশ হ'য়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আবার চুপ করে' গেলেন কয়েকদিন। ডায়েরি খুলে বিমর্যও হ'য়ে গেলেন। দেখলেন অনেকেই চিঠির উত্তর দেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল উত্তর পাওয়ার

জন্যে চিঠির সঙ্গে ঠিকানা-দেওয়া খাম দিয়ে দেবেন, কারণ উত্তর পাওয়ার গরজটা তাঁরই। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম ভদ্রতাবোধে আবিষ্ট হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তিনি খাম দেন নি। যাঁকে চিঠি লিখছেন তিনি ভদ্রলোক এ বিশ্বাস তিনি শেষ পর্যন্ত রেখেছিলেন। উত্তর না পেয়ে হতাশ হলেন বটে কিন্তু তার মধ্যেই সান্ত্বনাও পেলেন একটু। মনে হ'ল উত্তরের জন্য খাম না দিয়ে এক হিসাবে ভালই করেছেন তিনি, এতে কে ভদ্র কে অভদ্র তা সহজে ধরা পড়েছে। মেয়ের বিয়ে তিনি ভদ্র পরিবারেই দিতে চান, কিন্তু কোথায় সে ভদ্র পরিবার। কি করে' নাগাল পাবেন তার। সবাই যে আজকাল মুখোশ-পরা। মুখোশের আড়ালে কে ভদ্র কে অভদ্র তা খুঁজে পাবেন কি করে'। এই চিন্তায় তিনি যখন মগ্ন তখন হরমোহিনী দেখা দিলেন রঙ্গমঞ্চে। তাঁর মন খুব খুশী। বরেনের চিঠি এসেছে। আজও তাঁর হাতে একটি চিঠি।

"শুনছ, শিউলি চিঠি লিখেছে। খুব ভালো পাত্রের খবর দিয়েছে সে একটা।"

"শিউলি? আমাদের বউমা?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আবার কোন্ শিউলি চিঠি লিখতে যাবে আমাকে?"

"কি লিখেছে—"

"খুব ভালো একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছে সে। কলকাতায় তার আলাপী তো অনেক। পার্কে ওদের মহিলা সমিতি আছে, সেখানকার ও মেম্বারও একজন। সেইখান থেকে এই খবরটি পেয়েছে। একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট সংসার। এক ছেলে এক মেয়ে। মেয়েটির বিয়ে হ'য়ে গেছে। সেই মেয়েরি ননদ খবরটি দিয়েছে।"

"ছেলে করে কি?"

"ইন্‌জিনিয়ার। বড় ফার্মে চাকরি করে। এই দেখ না সব লিখেই দিয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত পড়লেন চিঠিটি। পাত্রটিকে ভালো লাগল। গঙ্গোপাধ্যায় উপাধি দেখে তাঁর বাল্যবন্ধু বিকাশ গাঙ্গুলীকেও মনে পড়ল। দেব-চরিত্র লোক ছিল সে। অন্যমনস্ক হ'য়ে তার কথাই ভাবতে লাগলেন। একটি যুবতীর মান বাঁচাতে গিয়ে গুণ্ডার হাতে প্রাণ দিয়েছিল সে। তার উজ্জ্বল মুখটা বার বার মনে পড়তে লাগল।

"ভুরু কুঁচকে ভাবছ কি! আজই চিঠি লিখে দাও—"

"হ্যাঁ দিচ্ছি—"

তখনই তিনি চিঠি লিখতে বসে' গেলেন।

হরমোহিনীও গিয়ে ঢুকলেন ঠাকুরঘরে।

বার

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় ভীতু প্রকৃতির লোক। চিরকাল সবাইকে ভয় করে' এসেছেন। বাবা, মা, ভূত-প্রেত, তেত্রিশ কোটি দেবতা, স্কুলের শিক্ষকরা, আপিসের বড়বাবু, জাঁদরেল প্রতিবেশী সবাই তাঁকে ভয় দেখিয়েছে, বৃদ্ধবয়সেও তিনি ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পান নি। গৃহিণী এবং ছেলে-মেয়ের ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত। গৃহিণী বিশালকায়া, নীলকণ্ঠবাবু খর্বাকৃতি। এই বিসদৃশ দম্পতিকে দেখে একজন রসিক একবার মন্তব্য করেছিলেন তুলোর বস্তার উপর নেংটি ইঁদুর ছুটোছুটি করে' বেড়াচ্ছে যেন।

বস্তুতঃ, নীলকণ্ঠবাবু সত্যিই দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। খুরখুর করে' তাড়াতাড়ি হাঁটেন, হাঁটতে হাঁটতে চট্ করে' থেমে গিয়ে

এদিক ওদিক তাকান, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে দিক পরিবর্তন করে' খুরখুর করে' অন্য দিকে চলে' যান আবার। ছোট ছোট চোখ, ছোট ছোট কান, রং ঘোর কালো। সরু একজোড়া গোঁফ আছে, যখন কাঁচা ছিল, তখন তার অস্তিত্ব বোঝা যেত না। এখন পাক ধরাতে সেটি পরিদৃশ্যমান হয়েছে। মেয়ের বিয়ের সময় তিনি অবশ্য কন্যাসম্প্রদান করেছিলেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রেও তাঁর নাম ছাপা ছিল, কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত ছিল না। হাত ছিল তাঁর দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের, হাত ছিল তাঁর গৃহিণীর এবং হাত ছিল তাঁর মেয়ে শৈলবালার।

নবীন মুখুজ্যের ছেলে তরুণ যেই বিলেত থেকে ডাক্তারি পাস করে' এল, অমনি নীলকণ্ঠগৃহিণী তাকে নিমন্ত্রণ করলেন। একবার নয়, বার বার। শৈলবালা তাকে সকাল-বিকাল আধুনিক গান শোনাতে লাগল, দশাসই শ্যালক দিগিন্দ্র ঘোষালের জীপে চড়ে' তারা সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় পিকনিকেও মেতে উঠল। নীলকণ্ঠ ক্ষীণকণ্ঠে এই সব অশোভন কাণ্ডকারখানার প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করেছিলেন একবার। কিন্তু গৃহিণীর ধমক খেয়ে তাঁকে থেমে যেতে হয়েছিল, থেমে গিয়ে তাই করেছিলেন চিরকাল যা করে' এসেছেন, মুখ কাঁচুমাচু করে' ময়লা পৈতেটা টেনে ধরে' পিঠ চুলকেছিলেন।

শৈলবালা আধুনিক মেয়ে। সে জানে এ যুগে সাহস করে' এগিয়ে যেতে হয়, লোভনীয় জিনিসটা হামড়ে পড়ে' সংগ্রহ করতে হয় ভিড় ঠেলেঠুলে। সসংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেই অপরে সেটি নিয়ে নেবে। শৈলবালা পষ্টাপষ্টি নাম করতে চায় না, কিন্তু সে দেখেছে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের কাছ-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফোটো তুলিয়েছে এমন অনেক অভাজন যাদের নাম পর্যন্ত জানত না কেউ আগে, কিন্তু যারা বড়লোকদের সঙ্গে কাঁধঘষাঘষি করেই শেষ পর্যন্ত পাদ-

প্রদীপের বন্দনা লাভ করেছে। দূরে সরে' থাকলে গুণের বা রূপের কদর হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয়, বিজ্ঞাপিত করতে হয়। তার বাল্যসখী কঙ্কাবতী চক্রবর্তীও টোপ ফেলেছিল এবং শৈলবালা অবহিত না হ'লে হয়তো গেঁথেও ফেলত তরুণকে, কিন্তু শৈলবালার তৎপরতায় হার মানতে হয়েছে তাকে। চটপট বিবাহটা চুকেও গেছে নির্বিঘ্নে।

নীলকণ্ঠবাবু মেয়ের বিয়ের জন্য হাজার দশেক টাকা রেখেছিলেন। কিছু খরচ হয় নি। নবীনবাবুও খরচের দায় এড়িয়েছেন। কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে। নীলকণ্ঠবাবু ভেবেছিলেন এইবার ছেলের বিয়ে দেবেন এবং হয়তো সেই অনাগতা নববধূটির কাছে তাঁর ভীত মন একটু প্রশ্রয় পাবে, হয়তো সে তাঁকে যখন তখন এমন বকবে না। কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে গেল। তাঁর ইন্‌জিনিয়ার পুত্র নূতন স্বপ্ন দেখে বসল একটা। তার মাকে বলল, শৈলর বিয়েতে তোমাদের তো একটি পয়সা খরচ হ'ল না। ওই টাকাটা আমাকে দাও না, আমি বিলেত ঘুরে আসি। দুটি বছর ছেড়ে দাও আমাকে, বিলেত থেকে আমি ভালো ডিগ্রি নিয়ে আসছি। বিলিতী ডিগ্রি থাকলে চাকরির বাজারে অনেক দাম বেড়ে যাবে।

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও ভেবেছিলেন ছেলের এইবার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিলেত-ফেরত ছেলের সঙ্গে শৈলর বিয়ে হ'য়ে যাওয়াতে তাঁর মনের মধ্যে একটু গোল বেধেছিল। জামাইয়ের বিলিতী ডিগ্রি রয়েছে, অথচ তাঁর ছেলের নেই এই সত্যটাকে যেন ঠিকমতো পরিপাক করতে পারছিলেন না। তাঁর আত্মসম্মান যেন ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। ছেলের কথায় তিনি উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন, বেশ তো, চলে' যা। টাকা তো আছেই, সেই ভালো।

এ প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ একটু বিব্রত হলেন মনে মনে। শৈলর

তৎপরতায় এবং কর্মপটুতায় তাঁর যে টাকাটা বেঁচে গিয়েছিল সে টাকাটার উপর তিনি অনেকখানি ভরসা করেছিলেন। কারণ ওই টাকাটাই ছিল তাঁর যথাসর্বস্ব। আমাদের বাঙালী হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে সম্বন্ধ করে' বিয়ে দিতে গেলে তাঁকে সর্বস্বান্ত হয়েই বিয়ে দিতে হ'ত। শৈল যেভাবে বিয়ে করেছিল সেটা যদিও তাঁর মনঃপূত হয় নি, কিন্তু টাকাটা বেঁচে যাওয়াতে মনে মনে খুশীই হয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন বুড়ো বয়সে অথর্ব হ'য়ে পড়লে ওই টাকাটাই তাঁর সহায় হবে। তাঁর বন্ধু জগদীশ মিত্তিরের অবস্থা দেখে তাঁর এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে বৃদ্ধবয়সে টাকা না থাকলে ছেলে মেয়ে বউ কেউ পোঁছে না, তাদের গলগ্রহ হ'য়ে থাকতে হয়। দরিদ্র পক্ষাঘাতগ্রস্ত জগদীশ মিত্তিরের বিছানাও রোজ বদলানো হয় না। বেচারার টাকা থাকলে চাকরে অন্ততঃ তাঁর সেবা করত। জগদীশ মিত্তির ছেলেদের পড়িয়ে এবং মেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে গেছেন। ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত, বৃদ্ধ পিতার যথোচিত সেবা তারা করতে পারে না।

ছেলের প্রস্তাব শুনে নীলকণ্ঠ বললেন, "বেশ তো, বিলেত যাও, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাবার আগে বিয়ে করে' যাও।" নীলকণ্ঠ ভেবেছিলেন, ছেলের বিয়েতে নগদ কিছু আদায় করতে পারবেন হয়তো এবং তাতে বিলাত যাওয়ার খরচের খানিকটা অন্ততঃ উঠে যাবে।

ছেলে কিন্তু এটা অন্যভাবে নিয়ে চটে' উঠল। মাকে বলল, "কেন, তোমরা কি মনে করছ বিয়ে না করে' গেলে ওদেশে আমি মেমসাহেবের ফাঁদে পড়ে যাব? আমাকে বিশ্বাস করে' দেখ, আমি তোমাদের সে রকম ছেলে নই যে তোমাদের মুখে কালি দেব।"

নীলকণ্ঠ-গৃহিণীর হৃদয় পুত্র-গর্বে ভরে' উঠল। মায়ের মন

স্বভাবতই ছেলেদের কথা বিশ্বাস করবার জন্যে উন্মুখ হ'য়ে থাকে। সুতরাং তিনিও ছেলের সঙ্গে যোগ দিয়ে চোখ রাঙিয়ে বকলেন নীলকণ্ঠকে—"ছি ছি, কি নীচ মন তোমার, নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করতে পার না।" হকচকিয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ। তিনি কেন যে ছেলেকে বিয়ে করে' বিলেত যেতে বলছিলেন তা-ও বিবৃত করে' বলতে তাঁর সাহসে কুলোল না। তিনি অপ্রস্তুত মুখে ময়লা পৈতেটা টান করে' ধরে' পিঠ চুলকোতে লাগলেন। ইন্‌জিনিয়ার ছেলের খবর চাপা ছিল না। অনেক জায়গা থেকেই সম্বন্ধ আসছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠিও পেয়েছিলেন তিনি। সকলকেই এক উত্তর দিলেন।

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার সহিত কুটুম্বিতা হইলে অতিশয় সুখী হইতাম। কিন্তু এখন এ বিষয়ে আপনাকে কোনও কথা দিতে পারিতেছি না। কারণ, আমার পুত্র বিলাতে গিয়া আরও পড়াশোনা করিবে স্থির করিয়াছে। এখন সে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নয়। দুই বৎসর পরে সে বিলাত হইতে ফিরিবে। সুতরাং এখন ঐ বিষয়ে কোনও আলোচনা করা বৃথা। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি—

বিনীত
শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।

চিঠি পেয়ে ব্রজেন্দ্রবাবু তো দমে গেলেনই, হরমোহিনীও গেলেন। তাঁর বউমার-দেওয়া এই সম্বন্ধটি যে নির্ঘাৎ লাগবেই, কেন জানি না, এই রকম একটা ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাঁর ঠাকুরের

মুখের দিকে চেয়েও তিনি যেন একটু মৃদু হাসি লক্ষ্য করেছিলেন যাতে তাঁর মনে আশা হয়েছিল যে ঠাকুর বোধহয় দয়া করলেন। নীলকণ্ঠবাবুর চিঠি পড়ে' তাঁর মনে হ'ল ঠাকুর যে হাসিটি হেসেছিলেন তা ব্যঙ্গের হাসি। চটে উঠলেন তিনি শিউলির উপর। শুধু শিউলির উপর নয়, আজকালকার মেয়েদের উপরও।

"কি যে আজকালকার ফাজিল মেয়েগুলো, না আছে তাদের কথাঁর ওজন, না আছে দাম। বাজে উড়ো কথা নিয়ে চালাচালি করে কেবল"—বলেই দুমদুম করে' ভিতরের দিকে চলে' গেলেন। ইঁদুর ফাঁদে ধরা পড়লে আর যাই করুক হাসে না। ব্রজেন্দ্রবাবুও ফাঁদে পড়েছিলেন, তবু তাঁর মুখে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল। কারণ তিনি মানুষ, ইঁদুর নন। শুধু হাসিই ফুটল না, মতলবও জাগল একটা। নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়কে আর একটি পত্র লিখলেন তিনি। চিঠির খেলো কাগজখানা দেখে তাঁর মনে হ'ল টাকার লোভ দেখালে হয়তো কাজ হ'তে পারে। ব্রজেন্দ্রবাবুর অনুমান মিথ্যা ছিল না, নীলকণ্ঠবাবুর যদি হাত থাকত তাহলে হয়তো এতে কাজও হ'ত। তাছাড়া আর একটা দুর্ঘটনা ঘটল। চিঠিখানা পড়ল তাঁর ছেলের হাতে। আজকালকার অধিকাংশ ছেলেরাই নানা ছলে পণ নেয়, কিন্তু সেটা সোজাসুজি বা খোলাখুলি বললেই তাদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখেছিলেন—

নমস্কারান্তে সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার পুত্র উচ্চতর শিক্ষালাভ করিবার জন্য বিদেশে যাইতেছে ইহা অত্যন্ত আনন্দজনক খবর। কিন্তু বিদেশে যাইবার পুর্বে সে যদি বিবাহ করিয়া স-স্ত্রীক বিদেশে যায় তাহা হইলে ক্ষতি কি। আমার

মেয়েও এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, সম্ভবতঃ পাস করিবে। আপনি যদি আপনার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন তাহা হইলে সে-ও বিদেশে গিয়া স্বামীর সহিত লেখাপড়া করিতে পারে। স্বীকার করি ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, কিন্তু আপনি যদি অনুমতি এবং অভয় দেন উভয়েরই ব্যয়ভার বহন করিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার নমস্কার জানিবেন। আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। তাড়াতাড়ি পত্রের উত্তর দিলে বাধিত হইব। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি এল। চিঠির হস্তাক্ষর নীলকণ্ঠের, কিন্তু চিঠির ভাষা ও ভাব তাঁর পুত্রের। চিঠিখানা পেয়ে তাঁর পুত্র যে উত্তর লিখে দিয়েছিল গৃহিণীর আদেশে নীলকণ্ঠ তাই টুকে পাঠিয়েছেন। টাকার লোভে নীলকণ্ঠ-গৃহিণীও যে বিচলিত হন নি তা নয়, কিন্তু তিনি পুত্রের আদর্শ-প্রীতিতে এবং পুত্র-গর্বে এত বিমোহিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে টাকার প্রশ্নটা তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর কাছে। তাছাড়া আর একটা নিগূঢ় কারণও ছিল। তিনি ভাবলেন নিজের মেয়েকে বিলিতী শিক্ষা দেবার জন্যে উনি টাকা খরচ করবেন তাতে তাঁদের সংসারে কি লাভ হবে। বিলিতী লেখাপড়া আর হাবভাব শিখে তাঁর মেয়েটি যদি হাই-হিল-জুতো-পরা নাক-তোলা ঘাড়-ছাঁটা মেমসাহেব হ'য়ে ফিরে আসেন তাহলে বিপদেই বরং পড়ে' যাবেন তাঁরা। তাছাড়া তাঁর মনের নেপথ্য-আকাশে এ বিশ্বাসটাও ধ্রুবতারার মতো জ্বলছিল যে তাঁর ছেলে যদি ভালো একটা বিলিতী ডিগ্রি আনতে পারে তাহলে অনেক মেয়ের বাপ সেধে তার পায়ে

বিশ পঁচিশ হাজার টাকা তো দেবেই, বেশীও দিতে পারে। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। ছেলেকে বললেন—খুব কড়া জবাব লিখে দে একটা আর স্বামীকে বললেন, ও যা লিখবে তুমি সেটা টুকে পাঠিয়ে দাও। যে চিঠি ব্রজেন্দ্রবাবু পেলেন তা এই—

প্রীতিভাজন মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ বিস্মিত এবং অপমানিত হইয়াছি। আপনি আমাকে এবং আমার পুত্রকে যে পণ-লোলুপ আত্ম-সম্মানহীন ব্যক্তিদের দলভুক্ত করিয়াছেন ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। ইহাও অনুভব করিতেছি, দোষ আপনার নয়, দোষ সমাজের। সমাজের হাওয়া যেদিকে বহিতেছে সেই হাওয়ার আনুকূল্য লাভের জন্য সেই দিকেই আপনি ঘুড়ি উড়াইয়াছেন। কিন্তু আপনার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি যে আমার পুত্রের শিক্ষার ভার লইতে আমি সক্ষম, ভবিষ্যতে আমার পুত্রবধূকেও যদি বিদেশী শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করি তাহার ব্যয়ভারও আমরা বহন করিতে পারিব। এজন্য আপনার অর্থসাহায্য আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমার পুত্র বিলাত যাইবার পূর্বে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। সে পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের আদেশেই বিনা দ্বিধায় পালন করে, তাহার মা-ও তাহাকে বিবাহ না করাইয়া বিলাত যাইবার অনুমতি দিয়াছেন। সুতরাং আপনার প্রস্তাবে সায় দিতে পারিলাম না। ক্ষমা করিবেন। নমস্কারান্তে—

ভবদীয়

শ্রীনীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়।

নীলকণ্ঠের এ চিঠির কথা ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে চেপে গেলেন হরমোহিনীর কাছ থেকে। কিন্তু একটা কথা তাঁর মনে হ'ল—কোন্ পাপে এদেশে মেয়ের বাপ হ'য়ে জন্মেছি। আগেকার দিনে সোজা-সুজি পণ দিয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ত, যারা পণ দিতে সক্ষম তারা অন্ততঃ মেয়ের বিয়েটা নির্ঝঞ্ঝাটে দিতে পারত। কিন্তু আজকাল এ কি কাণ্ড হয়েছে। পণপ্রথা তো ওঠেই নি, তার ওপর চেপেছে নানারকম মুখোশ, ভণ্ডামি আর চালিয়াতির ঢং। এর থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই। মুক্তির একটা চেহারা কিন্তু হঠাৎ এসে হাজির হ'ল তার পরদিনই। আগে একটা টেলিগ্রাম এল—Reaching tomorrow evening—Kusumika.

কুসুমিকা? চিনতে পারলেন না। নামটা আগে শুনেছেন কি না মনে পড়ল না। এমন কি এ ব্যক্তি মেয়ে না পুরুষ তা-ও সহসা ঠিক করতে পারলেন না ব্রজেন্দ্রনাথ। অনেক পুরুষের মেয়েলী নাম দেখেছেন তিনি। শেষে মনে হ'ল উষার কোন সহপাঠিনী সম্ভবতঃ। উষাকে ডাকলেন। তার হাতে টেলিগ্রামটা দিয়ে বললেন, "একে চিনিস?"

উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল উষার মুখ।

"ও, কুসুমদি আসছেন?"

"আমি তো চিনতে পারছি না—"

"বাঃ—তোমারই তো বন্ধুর মেয়ে। আগে আমাদের হেড্‌মিস্ট্রেস ছিলেন। মনে নেই তোমার? বিলেত গিয়েছিলেন। ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছেন আজকাল।"

তখন ব্রজেন্দ্রনাথের মনে পড়ল কুসিকে। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্রের মেয়ে।

তের

দেবেন মৈত্রর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। তিনি যখন প্রফেসারি করতেন, তখন দেবেন মৈত্রর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি যে কলেজে ছিলেন, সেই কলেজের কলেজিয়েট স্কুলে শিক্ষক ছিলেন দেবেনবাবু। যেমন দেবতার মতো রূপ ছিল, তেমনি দেবতার মতো স্বভাব। এঁর বন্ধুত্ব লাভ করে' কৃতার্থ হয়েছিলেন তিনি একদা। অথচ আজ তাঁর কথা মনেই পড়ে নি। আশ্চর্য মানুষের মন।

অনেকদিন পরে কুসি আসছে এ খবর পেয়ে সমস্ত মন আনন্দে ভরে' উঠল ব্রজেন্দ্রনাথের। কুসিকে শেষবার দেখেছিলেন এইখানেই মেয়েদের স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে। ঊষা তখন ওই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল। বেশ নাম করেছিল কুসি শিক্ষয়িত্রীরূপে। এখান থেকেই বিলেত চলে' যায়। সে যে স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস হয়েছে এ খবর পান নি ব্রজেন্দ্রনাথ। টেলিগ্রামটার দিকে চেয়ে স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলেন তিনি। দেবেনবাবুর কথাই মনে পড়ছিল। সমস্ত দিন নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন দেবেনবাবু। কারও বাড়ি বড় একটা যেতেন না। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছেও তিনি কম এসেছেন। কিন্তু যখনই আসতেন সঙ্গে করে' একটা পবিত্রতা বহন করে' আনতেন। তাঁর চোখ মুখ থেকে একটা বিশুদ্ধতার আভা যেন বিকীর্ণ হ'ত। আদর্শ-বাদী লোক ছিলেন। যৌবনে বিয়ে করেছিলেন এক গরীবের কুৎসিত কালো মেয়েকে। একটিমাত্র সন্তান হয়েছিল ওই কুসি। কুসিও রূপসী হয় নি এবং সেইজন্যেই দেবেনবাবু আদর করে' ওর নাম রেখেছিলেন কুসুমিকা।

দেবেনবাবুর নিজের সংসার ছোট ছিল, কিন্তু স্বার্থপরের মতো নিজের সংসার নিয়েই তিনি থাকতে পারেন নি। এই 'আপনি আর

কোম্পানি'র যুগেও অনেক আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকতেন তিনি। সামান্য স্কুল মাস্টার ছিলেন, মাইনে খুব বেশী ছিল না, প্রাইভেট ট্যুশনি করতেন না (যদিও বাড়িতে অনেক ছেলেকে বিনাপয়সায় পড়াতেন), ওই সামান্য আয়েও কৃচ্ছ্রসাধন করে' তিনি নিজের আদর্শ বজায় রেখেছিলেন। এর জন্যে সমাজের লোকও তাঁকে যে বিশেষ সম্মান করত তা নয়, অনেকে তাঁকে নির্বোধই বলত। কিন্তু সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতেন না দেবেনবাবু। স্কুল থেকে তিনি একটা কোয়ার্টার পেয়েছিলেন। মাত্র তিনখানি শোওয়ার ঘর ছিল তাতে। কিন্তু তিনি সেই তিনখানি ঘরকেই ছ'খানি ঘরে পরিণত করেছিলেন চৌকির সাহায্যে। রাত্রে একদল চৌকির উপরে শুত, আর একদল চৌকির নীচে। তিনি নিজে শুতেন একখানি চৌকির নীচে। সেইখানে বসে' পড়াশোনা করতেন, ছেলেদের হোম্‌টাস্‌কের খাতাও সংশোধন করতেন। আর ভোরে উঠে চলে' যেতেন স্কুলের সমীপবর্তী বটগাছটার তলায়। সেইখানে মাদুর পেতে বসতেন আর যে সব ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে পড়তে আসত তাদের পড়াতেন। কখনও শৌখিন কাপড় জামা পরেন নি। অধিকাংশ দিনই খালি পায়ে স্কুলে আসতেন, বিশেষ পর্ব উপলক্ষে বা স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টার এলে তালতলার চটি পায়ে দিতেন। চিনি কিনতেন না, পাঁউরুটি কিনতেন না, গুড় আর হাতে-গড়া রুটিই চিরকাল খেয়েছেন। রাত্রে তাঁর বাড়িতে রান্না হ'ত না। মুড়ি খেত সবাই। মুড়ি আর ছোলার ঘুগনি।

কুসির মা মুড়ির চাল কিনে নিজেই মুড়ি ভাজতেন। একটি গাই ছিল। তার যখন দুধ হ'ত, তখন রাত্রে মুড়ি খাওয়া চলত দিনকতক। কুসির মা-ই গরুর সেবা করতেন স্বহস্তে। জাব কাটতেন, দুধ দুইতেন, ঘুঁটেও দিতেন। বাছুর কখনো বিক্রি করেন নি

দেবেনবাবু। সৎপাত্রে দান করে' দিতেন। এরকম অদ্ভুত আদর্শবাদী লোক ব্রজেন্দ্রনাথ আর দেখেন নি।

কুসি তার বাবার অনেক গুণ পেয়েছিল। দেবেনবাবু তাকে নিজেই পড়িয়েছিলেন বাড়িতে। প্রাইভেটে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। পাস করবার পর তার বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিয়ে দিতে পারেন নি। তাকে বাড়িতেই আই. এ. পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তাঁর এক ভাইয়ের বড় চাকরি হ'য়ে গেল। ভাইটিকে দেবেনবাবুই মানুষ করেছিলেন। সেই ভাই কুসুমকে কলেজে ভরতি করে' দেয়। কলেজে গিয়ে কুসুমের সুপ্ত প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করল। দারিদ্র্যের পাথরে ঝরনাটা যেন চাপা ছিল, পাথরটা সরে' যেতেই দিগ্বিজয়িনীর মতো বেরিয়ে পড়ল সে কলোল্লাসে। কলেজের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে' বৃত্তিতে এবং পুরস্কারে যা পেতে লাগল তাতে তার নিজের পড়ার খরচ তো চলতই, দেবেনবাবুর সংসারেও সাহায্য হ'ত। এম. এ. এবং ডিপ-ইন-এড্‌এর বন্দর পর্যন্ত পৌঁছতে কোথাও আটকালো না কুসুমিকার। এর পরই পেল সে চাকরি। তারপর স্টেট স্কলারশিপ পেয়ে বিলেত গেল। বিলেত থেকেও ভালো ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে ডিভিশনাল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস অব স্কুলস হয়েছিল—এই খবর পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের জানা।

দেবেনবাবুও রিটায়ার করে' তাঁর গ্রামের বাড়িতে ফিরে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শুনেছিলেন সেখানেও নিজের বাড়িতে তিনি অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলেছেন একটি। অনেকদিন দেবেনবাবুর বা কুসুমিকার খবর পান নি। এতদিন পরে হঠাৎ কুসুমিকা আসছে কেন? সরকারী কাজ নিশ্চয়ই নয়, কারণ তার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ডিভিসনে। বদলি হ'য়ে আসছে কি? উষাই মোটর নিয়ে স্টেশনে গেল কুসুমিকাকে আনতে। খবরটা শুনে হরমোহিনী খুব খুশী হলেন না।

যে সব মেয়ের ভাবভঙ্গীতে পুরুষালির প্রভাব বেশী, মুখে কিছু বলতে না পারলেও, মনে মনে তাদের উপর খুব প্রীত নন হরমোহিনী। কুসুমিকা যখন ছেলেদের সঙ্গে টেনিস্ বা ব্যাড্‌মিন্‌টন খেলত আর কথায় কথায় হা হা করে' হেসে গড়িয়ে পড়ত তখন হরমোহিনী সেটা খুব পছন্দ করতেন না। মনে মনে বলতেন—'ধিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দেখ না!' যাই হোক যখন আসছে তখন অভ্যর্থনা করতেই হবে। একটা কথা তাঁর মনে পড়ল, কুসি পুডিং খেতে খুব ভালবাসে। পুডিংয়ের আয়োজন করতে লাগলেন তিনি।

চৌদ্দ

কুসুমিকাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীও কম অবাক হলেন না। তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন হাই-হিল-জুতো খটখটিয়ে, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলিয়ে, চোখে গগল্‌স্ এঁটে, গালে ঠোঁটে রং মেখে, হব্‌লকরা শাড়ির আঁচলা ঝলমলিয়ে বিবি-মার্কা কোনও আধুনিকার আবির্ভাব হবে বুঝি। কিন্তু কুসুমিকাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেলেন। অতি সাধারণ মিলের সাদা শাড়ি পরনে, মাথার চুল টান করে' বাঁধা, চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে রং নেই, গলার খাঁজে খাঁজে পাউডার নেই। কালো মুখখানিকে আলো করে' রেখেছে একটি স্নিগ্ধ নম্র হাসি। এই মেয়েই কিছুকাল আগে হুড়োহুড়ি করে টেনিস খেলত! এই মেয়ে এত বড় বিদুষী, বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে! হরমোহিনী বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে তার থুতনিতে হাত দিয়ে চুমু খেলেন এবং বলে' উঠলেন, "ওমা, এ কি ছিরি মেয়ের! এত রোজগার করছিস একটা ভালো শাড়ি কিনতে পারিস নি?" কুসুমিকা মৃদু হেসে চুপ করে' রইল।

"চল খাবি চল—"

জোর করে' অনেকখানি পুডিং, চারটে রসগোল্লা, ডবল ডিমের ওমলেট খাওয়ালেন তাকে।

খাওয়াদাওয়ার পর ব্রজেন্দ্রনাথ জিগ্যেস করলেন, "এখানে কি বদলি হ'য়ে এলি না কি? এখানকার স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের কোয়ার্টার তো খুব ভালো—"

"আমি তো স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেসের চাকরি অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি!"

"কেন?"

"ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত না। তাছাড়া এক ডাকবাংলোয় একটা অসভ্য এস. ডি. ও.কে চড়িয়েছিলাম বলে' গোলমালও হয়েছিল একটু!"

"চড়িয়েছিলি? সে কি!"

"হ্যাঁ, অশ্লীল অসভ্যতা করেছিল। আমি ও চাকরি ছেড়ে প্রফেসারি নিয়েছিলাম, কিন্তু তা-ও শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হবে।"

"এত কাণ্ড করেছিস কিচ্ছুই শুনি নি তো!"

অভিমানভরা কণ্ঠে কুসুমিকা বলল, "আপনি আজকাল আমাদের খবর আর রাখেন নাকি!"

ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে লজ্জিত হলেন, সত্যিই ওদের খবর অনেকদিন রাখেন নি। পৃথিবীতে পরিচিতের সংখ্যা রোজ এত বাড়ছে, আর তাদের খবরের পরিমাণও রোজ এত বেশী হচ্ছে যে সব দিকে হিসাব ঠিক রাখা মুশকিল। কিন্তু এ-ও তাঁর মনে হ'ল দেবেনবাবুর আর কুসুমিকার খবরটা তাঁর রাখা উচিত ছিল। কারণ ওদের সঙ্গে পরিচয়টা ছিল একটু স্বতন্ত্র ধরনের।

"প্রফেসারি ছাড়ছিস কেন?"

"বাবা ছেড়ে দিতে বলেছেন।"

"কেন হঠাৎ ?"

কুসুমিকা তখন সব কথা বলল। বক্তব্যটা বক্তৃতার মতো শোনালো অনেকটা।

"আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার পর জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অসাধুতা, কপটতা আর যথেচ্ছাচার চলছে। মনে হচ্ছে যেন মধ্যযুগীয় বর্বরতা আবার ফিরে এসেছে গণতন্ত্রের মুখোশ পরে'। যে দেশে অধিকাংশ লোকই মূর্খ, যে দেশে পয়সা দিয়ে ভোট কেনা যায়, লোভ দেখিয়ে হুমকি দিয়ে ভোট আদায় করা যায়, সে দেশে গণতন্ত্র কতকগুলি মতলববাজ লোকের হাতে পড়ে' অত্যাচারের যন্ত্র হ'য়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাদের বর্তমান তো অন্ধকারই, কিন্তু ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে আরও অন্ধকার। কারণ মনুষ্যত্ব গড়বার যে পথ তাই এঁরা কণ্টকাকীর্ণ করে' দিচ্ছেন। আমাদের দেশে শিক্ষার আবহাওয়া আজ বিষাক্ত। শিক্ষার পদ্ধতিই ভুলে ভরা। বাইরে থেকে মনে হবে আমাদের ছেলে-মেয়েরা বুঝি অনেক কিছু শিখছে,-কিন্তু কেউ কিচ্ছু শিখছে না। বইয়ের ভারে ছোট ছোট শিশুদের পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকে যাচ্ছে কেবল। তাদের শেখাবার মতো শিক্ষকও নেই। সুপারিশের জোরে ভাইপো-ভাগনারাই শিক্ষকের চাকরি পাচ্ছেন, ভালো লোকের স্থান নেই। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়েও চোরাকারবার অবাধে চলছে।

"আমি একটি মহিলা কলেজের মহিলা প্রিন্সিপালের খবর জানি। তিনি তাঁর বাজেমার্কা মেয়েকে ফার্স্টক্লাস অনার্স পাওয়াবার জন্যে চতুর্দিক তোলপাড় করে' বেড়াচ্ছেন। তাঁকে খুশী করবার জন্যে তাঁর অধীন কিংবা প্রসাদকামী পরীক্ষকেরা নির্বিচারে ঢেলে

ঢেলে নম্বরও দিচ্ছে তাঁর মেয়েকে। অথচ তার চেয়ে ঢের ভালো ছেলে-মেয়েরা কিচ্ছু পাচ্ছে না।

"অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আজকাল পরীক্ষকেরা খাতা পরীক্ষা করে' নম্বর দেন না, অনেক সময় নম্বর দেন জাত বিচার করে', কিংবা কোন্ প্রদেশবাসী তা জেনে নিয়ে, কিংবা ওপরওলার আদেশে বা অনুরোধে। ডিগ্রির আজকাল কোন মূল্য নেই, প্রকৃত শিক্ষার তো নেই-ই। চাকরির জন্যে যেন-তেন-প্রকারেণ ডিগ্রির একটা তকমা চাই। সে তকমাটা যত চকচকে হয় চাকরির ক্ষেত্রে ততই সুবিধা। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চালকরা আজকাল পক্ষপাতিত্ব করে' তাঁদের নিজেদের লোকেদের তকমাটা চকচকে করে' দেবার কাজে লেগেছেন উঠে পড়ে'। অবাধে ঘুষ দেওয়া-নেওয়াও চলছে। আজকাল আমাদের দেশের শিক্ষায়তনে শিক্ষা দেওয়া হয় না, গুণের বিচার করা হয় না, ভালো ছেলে-মেয়েদের পিছনে ঠেলে দিয়ে সামনে হাজির করা হয় সেই সব হস্তিমূর্খ ছেলে-মেয়েদের যারা দৈবাৎ আধুনিক রাজকুলের আত্মীয়স্বজন। দেশ যাতে ভবিষ্যতে আর কিছুতে মাথা তুলতে না পারে, তারই সুনিপুণ ব্যবস্থা করেছেন এঁরা। তাই আমার বাবা বলছেন চাকরি ছেড়ে দিতে। যে গভর্নমেন্টের আগাগোড়া কলুষিত সেখানে প্রতিবাদ করেও কোন লাভ নেই। সুতরাং ওদের সংস্রবই ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করে' নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। আমাদের এখন প্রধান কাজ মানুষ তৈরি করা। আমাদের গ্রামের যিনি জমিদার ছিলেন তিনি বাবার ছাত্র। তাঁর এখন জমিদারি নেই, কিন্তু কলকাতায় ব্যবসা করে' তিনি অনেক টাকা রোজগার করেছেন। তিনি বাবাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চান গ্রামে একটা স্কুল করবার জন্যে। বাবা বলেছেন তিনি স্কুলের ভার নিতে রাজী আছেন কিন্তু সে স্কুলের

সঙ্গে গভর্নমেণ্টের কোনও সংস্রব থাকবে না। সে স্কুলের একমাত্র লক্ষ্য হবে ভালো ছেলে-মেয়ে তৈরি করা। যারা পরীক্ষা পাস করে' চাকরি পেতে চায় তাদেরও পড়াশোনার ব্যবস্থা থাকবে তাতে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষা দিতে হবে প্রাইভেটে। বাবা আমাকে তাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে ওই স্কুলে যেতে বলছেন। মেয়েদের ভার আমার উপর থাকবে। কিন্তু আমি একা তো পারব না, তাই আমি আমার যে সব ভালো ছাত্রী ছিল তাদের খোঁজে বেরিয়েছি। ঊষা তো এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। ওকে দেবেন আমার সঙ্গে? আমাদের বাড়িতে থাকবে, মাইনেও কিছু দেব আমরা—”

এ প্রস্তাবের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না। হরমোহিনীও ছিলেন না।

ব্রজেন্দ্রনাথ সোজাসুজি 'না' বলতে পারলেন না। মাথা চুলকে বললেন, “ও এখনও ছেলেমানুষ আছে, ও কি পারবে?”

“খুব পারবে। বাবা বলেছেন কমবয়সী শিক্ষক-শিক্ষিকাই দরকার। তারাই আদর্শবাদী। তারা শুধু পড়াবে না, নিজেরাও পড়বে। আপনি ঊষাকে দিন—”

এইবার হরমোহিনী আসরে নামলেন।

“দেখ্‌ আমি তোর মতো লেখাপড়া শিখি নি, কিন্তু তোর চেয়ে আমার বয়স ঢের বেশী, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। এটা ভাল করে' বুঝেছি সময়ে বিয়ে না হ'লে মেয়েদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাপ মা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন খেতে পরতে পায়। আজকাল তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, চাকরিবাকরি করেও হয়তো অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারবে তোমবা, কিন্তু এটা জেনে রেখ শুধু খেয়ে পরে' বেঁচে থাকলেই মানুষের সুখ হয় না। বিশেষ

করে' মেয়েমানুষের। তার কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে চাই। তাতেই তার সুখ। অনেক বড়লোকের বাড়ির বাঁজা বউ মেয়ে দেখেছি, তাদের খাওয়াপরার অভাব নেই, কাপড়-গয়নাও অজস্র, কিন্তু মনে সুখ নেই। কারো ফিট হচ্ছে, কারও মাথায় ছিট এসে গেছে, কেউ মুখ গোমড়া করে' বসে' আছে দিনরাত, কেউ ঝগড়া করে' মরছে, অনেকে পাগলও হ'য়ে গেছে। মনে সুখ নেই কারও—। আমি বাপু আমার মেয়ের বিয়ে দেব, মাস্টারি-ফাস্টারি করতে দেব না। আর তুমি যদি তোমার কাকীমার কথাটি শোন তাহলে ওসব উদ্‌খুট্টে ব্যাপারে না মেতে একটি বিয়ে করে' ফেল।"

ব্রজেন্দ্রনাথও সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও সেই মত। বলিস তো তোর জন্যেও একটি ভালো ছেলের খোঁজ করি—"

হরমোহিনী ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তাঁর চোখে একটা ব্যঙ্গের হাসি চকমক করতে লাগল। মুখে যদিও তিনি কিছু বললেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে। নিজের মেয়ের জন্যে পাত্র জোটাতে পারছেন না, পরের মেয়ের ভার নিতে চাইছেন! আশ্চর্য লোক।

কুসুমিকা হেসে বলল, "বাবা তো আমার বিয়ের জন্যে কম চেষ্টা করেন নি। কিন্তু কেউ আমাকে নিলে না যে। আমাদের সমাজে রূপ রূপিয়া দুটোই চায় সকলে। আমার যে একটাও নেই।"

কুসুমিকা পরের ট্রেনেই ফিরে গেল।

যাবার সময় বলে' গেল উষার জন্য সে-ও পাত্রের সন্ধান করবে। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লেন। একথা তাঁর বারবার মনে হ'তে লাগল মেয়েদের আত্মসম্মানের যে উচ্চ আদর্শকে

তিনি বরাবর সমর্থন করে' এসেছেন, নিজের মেয়ের বেলা সে আদর্শের মান তিনি রাখতে পারলেন না। তাঁর বন্ধু দেবেন মৈত্র পেরেছেন, শত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও আদর্শের ধ্বজাটাকে উঁচু করে' রেখেছেন। কিন্তু তিনি পারলেন না। তিনিও হয়তো পারতেন, যদি উষা নিজে জোর করে' এগিয়ে আসত। কিন্তু উষা মায়ের দিকে চেয়ে চুপ করে' রইল মুচকি হেসে। মনে হ'ল মায়ের কথাতেই যেন ওর সায় আছে। ব্রজেন্দ্রবাবু তাই আর জোর পেলেন না, সাহস করতে পারলেন না। এই ভেবে সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করলেন যে সব মেয়ে কি একরকম হয়? সবাইকেই কি এক ছাঁচে ঢালা যায়?

কুসুমিকা চলে' যাবার পর হরমোহিনী তেমন কিছু মন্তব্য করলেন না। কিন্তু স্নান করে' উঠে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তিনি নিজের মনে যা বলছিলেন, তা ব্রজেন্দ্রনাথের কানে গেল।

"ওসব ওদের মতো মেয়েরই পোষায়। আমার মেয়ে বিলেতও যায় নি, চাকরিও করে নি। দুটো অচেনা পুরুষের সামনাসামনি হলেই ভয়ে নীল হ'য়ে যায়। সেরকমভাবে তো মানুষ করি নি। দুট্ করে' চাকরি করতে পাঠিয়ে দিলেই হ'ল। আমাদের একমাত্র মেয়ে, তাকে চাকরি করতে পাঠাবই বা কেন! ওর কথা আলাদা—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সব শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। ভাবলেন বলবার কি-ই বা আছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাও হ'ল, করাই বা যায় কি। সৎপাত্র তো ডুমুরের ফুলের চেয়েও দুর্লভ হ'য়ে উঠল। সেই দিনই তিনি আরও কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে চিঠি লিখলেন, যদি কেউ কোনও পাত্রের খবর দিতে পারে। তাঁর মনে হ'ল আমাদের সমাজে বিবাহ ব্যাপারটা ক্রমশঃই খুব জটিল হ'য়ে উঠছে।

পনরো

কয়েকদিন পরে কুসুমিকারই একটা চিঠি পাওয়া গেল। মজঃফরপুর থেকে লিখেছে:

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, ফিরে গিয়ে আপনাদের কথা বাবাকে সব বলেছিলাম। বাবাও কাকীমাব কথায় সায় দিলেন। বললেন, গৃহই মেয়েদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মক্ষেত্র। সে সুযোগ যখন পাওয়া যায় না তখনই মেয়েদের ক্ষেত্রান্তরে যেতে হয়। তিনি একটি পাত্রের খবরও দিয়েছেন। পাত্রটির নাম তিনি জানেন না, উপাধি চট্টোপাধ্যায় এই খবরটুকু শুধু জানা আছে। পাত্রের পুরা খবর ও ঠিকানা আপনি পাবেন দ্বিজেন চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে। তাঁর ঠিকানা নীচে দিলাম। দ্বিজেনবাবু বাবার পুরাতন বন্ধু। এখন পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হ'য়ে আছেন। সেজন্য মনে হয় চিঠি লিখে উত্তর পেতে বিলম্ব হবে। সব চেয়ে ভাল হয় আপনি যদি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। পূর্ণিয়া তো খুব বেশী দূর নয়। কাকীমার এক ভাইপোও তো সেখানে আছেন শুনেছি। তাঁকেও চিঠি লিখতে পারেন, তিনি দ্বিজেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে' ঠিকানাটা নিয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আমি এখানে এসেছিলাম আমার আর এক ছাত্রীর খোঁজে। মেয়েটি বিহারী, দু'বছর আগে এম. এ তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তার স্বামীও এম. এ, পি-এচ. ডি.। এরা দুজনেই আমাদের গ্রামের স্কুলে যোগদান করবে বলছে। এরা এবং এদের পরিবার-বর্গ কি যে ভালো, কত যে ভদ্র তা একমুখে বলা যায় না।

রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তে আজ প্রাদেশিকতার বিষ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে। বাঙালী বিহারী পরস্পরকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছে। কিন্তু এ বিষ সবাকেই আচ্ছন্ন করে নি। আদর্শবাদী, ভদ্র, মহৎপ্রাণ অনেক বিহারীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সারা দেশ জুড়ে অন্যায় ও অসাধুতার যে তাণ্ডব চলেছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হ'লে সব প্রদেশের আদর্শবাদী লোকদের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আমার বিশ্বাস সব প্রদেশেই এরকম আদর্শবাদী ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের খবর নিতে হবে, তাদেরও উদ্বুদ্ধ করতে হবে প্রকৃত স্বদেশ-সেবায়। দেশের আত্মসম্মান, শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে মরে' যাওয়ার আগে রক্ষা করতে হবে তাদের। এ কাজ শিক্ষকদের। আপনারা আশীর্বাদ করুন, এ ব্রত যেন উদ্‌যাপন করতে পারি।

উষার ভাল বিয়ে হবেই, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি পাত্রের খবর পেলেই আপনাকে জানাব। আপনি ও কাকীমা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। উষাকে আশীর্বাদ দেবেন। ইতি—

প্রণতা

কুসুমিকা।

চিঠিটা পড়ে' হরমোহিনী বললেন, "মেয়েটার সব ভালো, কিন্তু বড় জ্যাঠা হ'য়ে গেছে। কে জানে ভবিষ্যতে সুখী হবে কি না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ এবার আর চুপ করে' রইলেন না। বললেন, "তোমরা তো কোনোকালে জ্যাঠা ছিলে না, কিন্তু তোমরাই কি সুখী হয়েছ জীবনে? তোমাদের কথা শুনে তো মনে হয় তোমাদের মতো অসুখী ভূ-ভারতে আর কেউ নেই।"

"দেখ, আর কথা বাড়িও না। আমাদের অসুখ যে কোথায় এবং তার কারণ যে কি তা সবাই জানে। তুমিও জানো। সারা-জীবন কেবল না-জানার ভান করছ—"

ব্রজেন্দ্রনাথ আবার অনুভব করলেন তর্ক করা বৃথা। তর্কের খোরাক তিনি নিজেই জুগিয়েছেন ভেবে অনুতপ্ত হ'য়ে স-ক্ষোভে থেমে গেলেন।

যোদ্ধা হিসাবে হরমোহিনী ব্রজেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী উঁচুদরের। লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না কখনও। যদিও তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের মুখে থাবা মেরে নিজের বক্তব্য বারবার জাহির করেন, কিন্তু এটা তিনি নিঃসংশয়ে মনে মনে জানেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের সক্রিয় সহ-যোগিতা না থাকলে উষার বিয়ে হবে না।

তাই তিনি উক্ত বাদানুবাদের কাদা গায়ে না মেখে বেশ সহজকণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন—"দ্বিজেনবাবুর কাছে যাবে নাকি ? আমার যে ভাইপোর কথা কুসি লিখেছে সে তো আজকাল ওখানে নেই, ডালটনগঞ্জে বদলি হ'য়ে গেছে—"

প্রস্তাবটা শুনে বিব্রত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। তিনি যেখানে আছেন সেখান থেকে পূর্ণিয়া যাওয়ার চেয়ে দিল্লী যাওয়া সহজ। একা নদী বিশ ক্রোশ, কথাতেই আছে। কিন্তু যে সব ঘাট পেরিয়ে তাঁকে পূর্ণিয়া যেতে হবে সে সব ঘাটের কথা মনে হ'লে ক্রোশের হিসাবে কুলোয় না। দোনোমোনো হ'য়ে তাই বললেন, "দেখি—"

"না, আর দেখিটেখি নয়"—সঙ্গে সঙ্গে বলে' উঠলেন হরমোহিনী—"এই গোঁতোমি করে' করেই এতদিন দেরি করে' ফেলেছো। মেয়ের বিয়ের কথা কি আজ থেকে বলছি আমি। যখন ও ম্যাট্রিক পাস করলে তখন থেকেই সমানে বলে' আসছি।

বিয়ে যখন দিতেই হবে, ও ছাড়া যখন গতি নেই, তখন দেরি ক'রে লাভ কি !"

নিরুপায় ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বললেন, "তাহলে কালই বেরিয়ে পড়ি দুগ্‌গা বলে'—"

"কাল শনিবার, কাল কি যাওয়া হয় ? শুভকাজে শুভদিনে বেরুতে হবে। দাঁড়াও পাঁজিটা দেখাই—"

"কিন্তু শিউরাম তো ছুটি নিয়েছে, কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। আমার সঙ্গে যাবে কে—"

"আমি যাব। বিশুও চলুক। ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, খুব চটপটে ছোঁড়াটা—"

হরমোহিনী প্রায়ই ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সফরে বের হন। সুতরাং এ প্রস্তাবে ব্রজেন্দ্রনাথ খুব বেশী বিস্মিত হলেন না।

ষোল

শুভদিন দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ সপরিবারে যেদিন পূর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন সেই দিন বিহারের প্রসিদ্ধ 'পছিয়া' হাওয়াও উঠল। সে-ও বোধহয় শুভদিন দেখেই যাত্রা করেছিল। পছিয়া হাওয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, খুব হুহু করে' বয়। স্বভাবটা শুষ্ক রুক্ষ তপ্ত, একবার অঙ্গ স্পর্শ করলে মনে হয় জ্বলন্ত উনুনের কাছে কেউ ঠেলে দিলে বুঝি।

পছিয়া হাওয়ার আর একটি বিশেষত্ব, কখনও একা আসেন না। সঙ্গে থাকে প্রচুর ধুলো আর বালি। ধুলোবালি দিয়ে আকাশকে আচ্ছন্ন করে' দেবার ক্ষমতাও রাখেন ইনি। এঁকে সঙ্গী করেই বেরিয়ে পড়লেন ব্রজেন্দ্রনাথ ও হরমোহিনী। সঙ্গে ছোঁড়া চাকর বিশু।

—ট্রেনে অসম্ভব ভিড়। ফার্স্ট ক্লাসেও বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। আমারা এখন স্বাধীনতা পেয়েছি, সুতরাং অধিকাংশ লোকই টিকিট কেনে না। গাড়িতে চেকারবাবুরা থাকেন, কিন্তু চেক করেন না। স্বাধীনতা-প্রবুদ্ধ জনতার কাছ থেকে যতটা পারেন পয়সা আদায় করে' নিজেদের পকেটে পোরেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁদের নৈতিক শিক্ষাও উঁচুদরের নয়, তাঁরা যে বেতন পান তা দিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে তাঁরা সংসার চালাতেও পারেন না। সুতরাং এই 'উপরি'র উপরই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে। একথা ওঁদের উপরওলারাও জানেন বোধহয়। কারণ উপরে নালিশ করে' সুফল পাওয়া যায় না, বরং যাঁরা নালিশ করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন নিগৃহীতও হয়েছেন, এ খবর ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন।

আমাদের স্বাধীন গভর্নমেণ্ট পুরাতন জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে' নূতন জমিদারির পত্তন করেছেন। সেকালে জমিদারদের নায়েবরা মাইনে পেতেন কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা, কিন্তু থাকতেন রাজার হালে। আধুনিক জমিদারের নায়েবদেরও অনেকটা সেই অবস্থা। তাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা কিন্তু বেতন পান কম। তাঁদের লোভের, কামের, তাঁদের বিবিধ উচ্ছৃঙ্খলতার খোরাক যোগায় এই উপরি পাওনা।

গভর্নমেণ্টের দপ্তরে চিঠি লিখলে আজকাল উত্তর পাওয়া যায় না, উত্তর পেতে হলে কেরানীদের ঘুষ দিতে হয়। নিদারুণ ভিড়ে কষ্ট ভোগ করতে করতে এই সবই মনে হচ্ছিল ব্রজেন্দ্রনাথের।

সামনের সীটে একটি ছোকরা প্যাণ্ট আর বুশশার্ট পরে' সিগারেট টানছিল। বয়োবৃদ্ধ ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে একটুও সমীহ করছিল না সে। ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু এই ছোকরার দুর্বিনীত আচরণ দেখে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ? তাঁর

কষ্ট বাড়ল যখন ছেলেটি পাশের লোকটির সঙ্গে কথা কইতে লাগল। ছোকরা বাঙালী! হঠাৎ একটি বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে হরমোহিনীকে লক্ষ্য করে' সম্ভ্রমপূর্ণ-কণ্ঠে বললেন, "মাইজি, আপ বৈঠ যাইয়ে—"

হরমোহিনীও বিনয়ে হার মানবার লোক নন।

"নেই নেই আপ বৈঠিয়ে। হম্‌ ঠিক হ্যাঁয়—"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু হরমোহিনীকে হার মানতে হ'ল। বৃদ্ধ বিহারী ভদ্রলোকের সীটেই বসতে হ'ল তাঁকে।

"আপনি এখানে বসুন—"

একটি কমনীয় কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল গাড়ির অপর প্রান্ত থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন একটি রোগা মেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ওধারের কোণের সীট থেকে। হাওয়ায় তার রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে পড়ছে কপালের উপর, হাত দিয়ে সেটা ঠিক করে' নিচ্ছে সে বারবার। চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। শীর্ণ মুখ, রং কালো। কিন্তু মুখের হাসিটি কি সুন্দর! অনেকটা যেন ঊষার হাসির মতো।

"আপনি আসুন এখানে। আমি ওই দিকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি—"

ব্রজেন্দ্রনাথের সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল। তিনি আর মিথ্যা বিনয় প্রকাশ করলেন না। তাঁর মনে হ'ল ঊষাই তাঁকে ডাকছে। কিন্তু চাকরটা জিনিসপত্র নিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়িতে উঠেছিল, তাঁর চিন্তা হ'ল সে ঠিকমতো উঠতে পেরেছে কিনা। এ-ও তাঁর মনে হ'ল এই ব্যাপার নিয়ে হরমোহিনী হয়তো চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর দিকে চেয়ে কিন্তু অবাক হ'য়ে গেলেন তিনি। মুখে চিন্তার লেশ নেই। হাসিমুখে বেশ গল্প জুড়ে দিয়েছেন সেই বিহারী ভদ্রলোকের সঙ্গে। ভদ্রলোকও একেবারে গদ্‌গদ, মাতাজি মাতাজি বলে' খুব গল্প করছেন কপাটে

ঠেস দিয়ে।···হুহু করে' ধুলোর ঝড় বইছে। ওদিকের সব জানালা-গুলো খোলা। ব্রজেন্দ্রনাথ একজনকে বললেন জানালাগুলো বন্ধ করে' দিতে। একজন বিহারী হেসে বালিয়া জেলার ভাষাতে যা বললেন, তার মর্মার্থ—বন্ধ করতে বলছেন কেন বাবু। এ হাওয়া খুব ভালো হাওয়া, শরীরকে দুরুস্ত্ করে' দেয়। অসুখবিসুখ হয় না এ হাওয়া গায়ে লাগলে। সেই দিনই সকালে ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজে পড়েছিলেন এই হাওয়ার কৃপায় দশজন ভবযন্ত্রণা থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তিনি আর তর্ক করলেন না। নীরবে হাসিমুখে বসে' রইলেন।

সাহেবগঞ্জে নেমে আর এক সমস্যা। ওয়েটিং রুমের পশ্চিম দিকের জানালাটাই ভাঙা। অবাধে ধুলোর ঝড় ঢুকছে তার ভিতর দিয়ে। চেয়ার টেবিল সব ধুলোয় ভরতি। "এ ঘরে তো বসা যাবে না"—ব্রজেন্দ্রনাথ বলে' উঠলেন। "প্ল্যাটফর্মে তো দাঁড়ানও অসম্ভব"—শান্তকণ্ঠে বললেন হরমোহিনী। হরমোহিনীর শান্তভাব দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্চর্য হ'য়ে গেলেন। বাড়িতে যিনি পদে পদে অসহিষ্ণু বাইরে তিনি হঠাৎ এমন শান্ত হ'য়ে গেলেন কি করে'। ব্রজেন্দ্রনাথ জানতেন না যে সুযোগ পেলে হরমোহিনী বড় সেনাপতি হ'তে পারতেন, যে সেনাপতির একমাত্র লক্ষ্য যুদ্ধ জেতা। হরমোহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যেমন করে' হোক মেয়ের বিয়ে তাঁকে দিতেই হবে। শুধু দিতে হবে না, মনের মতো করে' দিতে হবে। এর জন্যে সব রকম কষ্টের সম্মুখীন হ'তে তিনি প্রস্তুত আছেন। পছিয়া হাওয়ায় ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

তিনি বিশুকে দিয়ে চেয়ার টেবিলগুলো ঝাড়াচ্ছিলেন। ব্রজেন্দ্র-নাথের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "তুমি ওই দিকের কোণটায় বস' না গিয়ে। ওখানে তো হাওয়া যাচ্ছে না—"

"আচ্ছা, আমি একবার দেখি গিয়ে—"

বেরিয়ে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তিনি। স্টেশন মাস্টারটি সেকেলে লোক। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, ঝাঁকড়া-গোঁফও কাঁচা-পাকা, ভুরু বেশ ঘন, তাতেও পাক ধরেছে। চোখ দুটি বড় বড় এবং রক্তাভ। শরীরটি নধর। গাল চিবুক চর্বি-স্ফীত। ব্রজেন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনে তাঁর চোখ দুটিতে চাপা হাসি ফুটে উঠল।

বললেন, "ওয়েটিং রুমের জানালাটা আর আয়নাটা কালই রাত্রে চুরি গেছে—"

"চুরি গেছে! পাহারা থাকে না—"

"সব থাকে, তবু গেছে। আমাদের যা কর্তব্য তা করেছি, জি. আর. পি.কে খবর দিয়েছি। পেটমোটা খাকি হাফপ্যাণ্টপরা একজন দারোগা সাহেব পান চিবুতে চিবুতে এসেছিলেন, এসে তদন্ত করে' রিপোর্ট লিখে নিয়ে গেছেন। ব্যস্, ব্যাপার ওইখানেই খতম হ'য়ে গেছে। আর কিছু হবে না। চোরাই মালও পাওয়া যাবে না, চোরও ধরা পড়বে না।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। স্টেশন মাস্টার তাঁর চোখের দিকে চেয়ে গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি ফুটিয়ে বললেন, "স্বাধীনতা পেয়েছেন, আবার কি চান! কোন্ ক্লাসের টিকিট আপনার—"

"ফার্স্ট ক্লাসের—"

"ফার্স্ট ক্লাসের আজকাল কি অবস্থা তা তো দেখেই এলেন। থার্ড ক্লাস ওর চেয়ে ভালো। আমাদের কর্তারা তো আজকাল সব প্লেনে যাতায়াত করেন তাই ফার্স্ট ক্লাসের গদিই ছিঁড়ুক আর আয়নাই ভাঙুক, সেদিকে তাঁদের নজর দেবার দরকার হয় না।

তাঁরা এখন নজর দিয়েছেন জনসাধারণ অর্থাৎ মুটে, মেথর, কিষাণ, মজহুরদের যাতে উন্নতি হয়। তাই থার্ড ক্লাসে বনবন পাখা ঘুরছে। ওসব দাদন, বুঝলেন, ভবিষ্যৎ ভোটের জন্য দাদন—"

হঠাৎ তাঁর চোখ হুটোতে দপ্ করে' আগুন জ্বলে' উঠল।

"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বস্থন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ সামনের চেয়ারটায় উপবেশন করলেন। বললেন, "গরীব লোকরা এতকাল হুঃখভোগ করে' এসেছে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর তারা একটু স্থখভোগ করুক তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের উপর এ অত্যাচার কেন—"

"আপনারা যে ভদ্রলোক। ওদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই আপনাদের ওরা ক্রাশ্ করে' ফেলতে চায়। আপনাদের গাড়ি খারাপ হবে, আপনারা ভালো খাবার পাবেন না, ভালো ওষুধ পাবেন না, আপনাদের ছেলেরা ভালো শিক্ষা পাবে না, চাকরি পাবে না। আর ওই কিষাণ মজহুরদেরও কি উন্নতি হচ্ছে ভেবেছেন? ওরা কি শিক্ষা পাচ্ছে? ওদের মাইনে বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাড়ির দোকানও বেড়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল আমাদের নেতাদের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার মর্ম বোধহয় বুঝতে পারেন নি ভদ্রলোক। বললেন, "সে যাই হোক, আমি এখন কি করি বলুন। আমাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে। এই পছিয়া হাওয়াতে ওই খোলা জানালার সামনে তো বসে' থাকা যাবে না। রেস্ট রুম আছে?"

"সব ভরতি!"

তারপর হঠাৎ গোঁফে আঙুল চালিয়ে বললেন, "তবে একটা ব্যবস্থা হ'তে পারে, যদি কিছু পয়সা খরচ করেন।"

"কি বলুন—"

"স্টেশন ইয়ার্ডে খানকয়েক করোগেটেড্ শীট পড়ে' আছে। মালগুদামের ছাতের জন্যে এসেছিল, সব খরচ হয় নি। ইয়ার্ডে পড়ে' আছে খানকয়েক। আপনি কুলি দিয়ে সেগুলো তুলে আনিয়ে ওই খোলা জানলার সামনে দাঁড় করিয়ে দিন, বাইরে থেকে ভিতরে তাহলে আর হাওয়া ঢুকবে না। আর অত হাঙ্গামা যদি না করতে চান, আমার ওই ইজিচেয়ারটা দখল করতে পারেন।"

"আমি তো একা নই। সঙ্গে স্ত্রীও আছেন—"

"ও, তাহলে ওই যা বললুম তাই করুন।"

একটু ইতস্ততঃ করে' ব্রজেন্দ্রনাথ আর একটি প্রশ্ন করলেন।

"আচ্ছা এখানে ভালো চা পাওয়া যাবে কি?"

"ভালো চা বলতে যা বোঝায় তা পাওয়া যাবে না। আমাদের ওই রেস্টুরেণ্টে আলকাতরার মতো কালচে রংয়ের খানিকটা গরম জল পাবেন অপরিষ্কার পেয়ালায়। তা খেয়ে যদি আপনার রাগ হয় ওইখানেই একটা 'কম্‌প্লেন্‌ট্ বুক' আছে তাতে লিখে দেবেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হবে না।"

স্টেশন মাস্টার চোখ বড় বড় করে' চেয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে। তারপর 'ফিক্' করে' হেসে ফেললেন। বললেন, "বসুন, আমি চায়ের ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি—ওরে ফাগুয়া—"

একটি ইউনিফর্ম পরিহিত কুলির আবির্ভাব হ'ল দ্বারপ্রান্তে।

"রেস্টুরেণ্টের ম্যানেজারবাবুকে বল গিয়ে আমার জন্যে ভাল 'এক পট' চা আলাদা করে' যেন করিয়ে দেন। এক্ষুনি চাই।"

ফাগুয়া চলে' গেল।

"কোথায় আপনার করোগেটেড্ শীটগুলো আছে? আমি তাহলে ততক্ষণ সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি—"

স্টেশন মাস্টারমশাই নিজেই বেরিয়ে একটা কুলিকে ডেকে সব বলে' দিলেন। তারপর ভিতরে এসে বললেন, "চারটে কুলি লাগবে। ওদের একটা টাকা দিয়ে দেবেন।"

করোগেটেড্ টিন দিয়েও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। হাওয়ার বেগে দুবার পড়েই গেল। তৃতীয়বার কয়েকটা ইঁটের সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভব হলেও হাওয়া সম্পূর্ণভাবে রোধ করা গেল না। দু'পাশে ফাঁক থেকে গেল আর হাওয়া ঢুকতে লাগল তার ভিতর দিয়ে। হরমোহিনী চা খেলেন না। একাই 'একপট' চা খেয়ে ঘামতে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ঘাম হওয়াতে খানিকটা আরাম পেলেন। তারপর হঠাৎ হরমোহিনীর দিকে চেয়ে একটা শিক্ষালাভ করলেন সহসা। হরমোহিনী ওয়েটিং রুমের এককোণে ছোট একটা বিছানা পেতে পাশ ফিরে শুয়েছিলেন মুখ ঢেকে। মনে হচ্ছিল তিনি যেন সমস্ত প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ওই আত্মসমর্পণটাই যেন বর্মের কাজ করছে তাঁর। ব্রজেন্দ্রনাথও তাই করলেন। হাওয়া, ধুলো, গরম সমস্ত অগ্রাহ্য করে বসে' রইলেন মরিয়ার মতো। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—কেন এত কষ্ট সহ্য করছি? কি দরকার ছিল? মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে কি এতটা কৃচ্ছ্রসাধন না করলে চলত না? তাঁর বিবেক উত্তর দিল, না চলত না। আধুনিক যুগের সঙ্গে পা ফেলে যখন তুমি চলতে পারবে না তখন তোমাকে প্রাচীন প্রথাতেই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, আর সে প্রথা মানতে হ'লে এসব কষ্ট অনিবার্য। তুমি পিতা, পিতার কর্তব্য তোমাকে পালন করতে হবে। তাঁর পিতৃবন্ধু মুখুজ্যে মশাইয়ের একটা উপদেশ মনে পড়ল। কোন কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে অলস হ'য়ে বসে' থাকলে চলবে না। সিদ্ধিলাভ করবার যত রকম উপায় তোমার

মাথায় আসবে সবগুলোকে অনুসরণ করে দেখতে হবে। উদ্যম চাই, পুরুষকার চাই, তা না হ'লে কিছু হবে না।

হঠাৎ হরমোহিনী মুখের কাপড়টা সরিয়ে প্রশ্ন করলেন, "পূর্ণিয়ার দ্বিজেনবাবুকে কবে চিঠি দিয়েছিলে?"

"দিন সাতেক আগে। বেরুবার আগে একটা টেলিগ্রামও করেছি—"

"ওঁদের সঙ্গে আমাদের জানাশোনা নেই। ওঁদের বাড়িতে গিয়ে ওঠাটা কি ঠিক হবে? ওখানে যদি হোটেল টোটেল থাকে সেই-খানেই গিয়ে উঠব, বুঝলে—"

"ওসব শহরে হোটেল না থাকারই কথা। ডাকবাংলোয় উঠব। সেখানেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি—"

সাহেবগঞ্জ থেকে সক্‌রিগলি ঘাটে এলেন তাঁরা সন্ধ্যা প্রায় সাতটায়। তারপর স্টীমার। অসম্ভব ভিড় সেখানেও। ধাক্কাধাক্কি করে কোনমতে জায়গা পেলেন ফার্স্ট ক্লাসে। মনিহারিঘাটে পৌঁছলেন যখন, তখন রাত প্রায় দশটা। সেখানেও উঁচু পাড় ভেঙে জনতার ধাক্কা খেতে খেতে গিয়ে কোনক্রমে ট্রেনে উঠলেন। এ ট্রেনেও ভয়ানক ভিড়। হরমোহিনীকে কোনরকমে বসিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলেন। এর পর কাটিহারেও নাকি আবার গাড়ি বদলাতে হবে। হরমোহিনী সমস্ত দিন কিছু খান নি। গাড়ির জানালা দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন সামনেই একটা খাবারের দোকান।

"তোমার জন্যে কিছু খাবার কিনব? ভালো পানতোয়া রয়েছে—"

ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন পানতোয়া মিষ্টান্নটি হরমোহিনীর খুব প্রিয়।

"কিছু কিনে নাও। পৌঁছে কাপড়চোপড় ছেড়ে খাব'খন।"

"এখনি খাও না। সমস্ত দিন তো উপোস করে আছ।"

"উপোস করলে আমি ভালোই থাকি।"

ব্রজেন্দ্রনাথের তখন মনে পড়ল হরমোহিনী ব্রত-এক্‌স্‌পার্ট। বহুরকম ষষ্ঠী, জয়মঙ্গলবার, শিবরাত্রি, অষ্টমী, নবমী—কিচ্ছু বাদ দেন না।

সতর

পূর্ণিয়া স্টেশনে নেমে ব্রজেন্দ্রনাথ আর হরমোহিনী অবাক হ'য়ে গেলেন। দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে এসেছে মোটর নিয়ে! এটা তাঁরা প্রত্যাশা করেন নি। ব্রজেন্দ্রনাথের এ-ও মনে হ'ল যদি তিনি খোলাখুলি দ্বিজেনবাবুকে পাত্রের কথা লিখতেন তাহলে তাঁর ছেলেরাই তো উত্তর দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সে কথা তিনি লেখেন নি। লিখেছেন—'কোন কার্যবশতঃ আমাকে পূর্ণিয়া যেতে হবে, সেই সময় আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ আগ্রহ এই জন্যে যে আপনি দেবেনের বন্ধু। আমার সঙ্গেও দেবেনের বন্ধুত্ব অনেককালের, সে আমার সাধারণ বন্ধু নয়, শ্রদ্ধেয় বন্ধু।' এই ভণ্ডামিটুকু না করলে ব্রজেন্দ্রনাথকে এই পথ-কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না। ভণ্ডামি করবার কারণ অবশ্যই ছিল। প্রত্যেকের কাছে মেয়ের বিয়ের জন্য মিনতিপূর্ণ চিঠি লিখতে অনেকদিন থেকেই তাঁর আত্মসম্মানে বাধছিল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভিখারীর পর্যায়ে নেমে যাচ্ছেন। তাছাড়া কুসুমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে মনে তিনি যেন অপরাধী হ'য়ে পড়েছিলেন। হরমোহিনীর সামনে যদিও কথাটা তিনি প্রকাশ

করতে পারেন নি, কিন্তু নিজের অন্তরের মধ্যে তিনি অনুভব করেছিলেন যে কুসুমিকাই ঠিক পথ ধরে' চলেছে, ওই আত্ম-সম্মানের পথ। কুসুমিকার সঙ্গে দ্বিজেনবাবুর ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই তাঁকে মেয়ের বিয়ের কথাটা চিঠিতে জানাতে সংকোচ হয়েছিল তাঁর।

দ্বিজেনবাবুর দুই ছেলে সমর এবং অমরকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন তিনি। যেমন চেহারা, তেমন কথাবার্তা, তেমনি সভ্য আচরণ। যদিও কথাটা শুনতে হাস্যকর তবু তারা তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে দেখে শুধু পুলকিত নয়, বিস্মিত হ'য়ে গেলেন তাঁরা। আজকালকার অধিকাংশ ছেলে-মেয়েরাই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না, অনেকে প্রণামই করে না, দেখা হ'লে মুচকি হাসে একটু। একজন তাঁকে বলেছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী নাকি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বারণ করেছেন। তিনি কোথায়, কি সূত্রে কবে বারণ করেছেন তা তাঁর জানা নেই, কিন্তু একথাটা তাঁর অজানা নয় যে প্রধানমন্ত্রীর অনেক উপদেশই ছেলে-মেয়েরা পালন করে না। হঠাৎ এই উপদেশই পালন করবার দিকে তাদের এমন প্রবণতা কেন! এর যে অনিবার্য উত্তর তাঁর মনে জেগেছিল তা আনন্দজনক নয়। সমর এবং অমরকে দেখে তাই খুব ভালো লাগল তাঁর।

দ্বিজেনবাবু পক্ষাঘাতগ্রস্ত বটে, কিন্তু মোটেই জীবন্মৃত নন। বেশ জীবন্ত। পা দুটোই অবশ হয়েছে, শরীরের উপরার্ধ ঠিক আছে। তাঁর ছাত-কাঁপানো হাসি শুনে ব্রজেন্দ্রনাথের তাক লেগে গেল। বেশ বলিষ্ঠ লোক। ঘন ভুরু, পুরুষোচিত গোঁফ, দৃঢ় চিবুক, ব্যঞ্জনাময় চোখের দৃষ্টি, প্রশস্ত বুক, উন্নত ললাট দেখলে শ্রদ্ধা হয়। অল্পদিন হ'ল রিটায়ার করেছেন। বয়স ষাটের কোঠায়

এখনও পৌঁছয় নি। তাঁকে দেখলে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়। কথায় কথায় চোখ মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। আর রসিকতার মাত্রা সামান্য বেশী হ'লে হা হা করে' ফেটে পড়েন হাসিতে।

ব্রজেনবাবুকে বললেন, "আপনার পায়ের ধুলো আমার বাড়িতে পড়ল আমি কৃতার্থ হলাম। আর বৌদিও যে এসেছেন এতে কি খুশী যে হয়েছি তা বলবার নয়। দেবেনের কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। দেবেনের ধারণা আপনি যদি প্রফেসারি লাইনে থাকতেন দেশের ঢের বেশী উপকার হ'ত। আপনার ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান দেখে সে মুগ্ধ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ মৃদু হেসে বললেন, "দেবেন বাড়িয়ে বলেছে। দুজনে বন্ধুত্ব ছিল তো খুব!"

"প্রফেসারি লাইন আপনি ছেড়ে দিলেন কেন—"

"প্রফেসার থেকে আমি প্রিন্সিপালও হয়েছিলাম, আর সেইটেই হ'ল আমার কাল। কলেজে একজন নতুন প্রফেসার নেওয়া হ'ল। আমি একটি ফার্স্ট ক্লাস ছেলেকে রেকমেণ্ড করেছিলাম। কিন্তু তাকে নেওয়া হ'ল না। নেওয়া হ'ল একটি থার্ড ক্লাস ক্যাণ্ডিডেট্‌কে, সে একজন হোমরা-চোমরা মেম্বারের জামাই বলে'। এর পর আর চাকরি করতে পারলাম না। ইস্তফা দিয়ে চলে' এলাম। আর একটা কলেজে প্রফেসারির চাকরি পেয়েছিলাম কিন্তু আমার এক মাড়োয়ারি ছাত্র সুন্দরমল আমাকে আর চাকরি নিতে দিলে না। এক হিসেবে ভালই হয়েছে। আর্থিক কষ্ট আর নেই, যখন প্রফেসার ছিলাম বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোতো না। এখন দু'দিকেই কুলুচ্ছে। গিন্নী খুশী আছেন।"

ঘর কাঁপিয়ে হা হা করে হেসে উঠলেন দ্বিজেনবাবু। তারপর

বললেন, "দেশের ছেলে-মেয়েরা কিন্তু আপনার মতো একজন প্রফেসার তো হারালো।"

ব্রজেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, "আপনি ওকথা বলছেন বটে, কিন্তু আমাদের দেশ সত্যিই কি গুণীকে চায়? আমার মনে হয় চায় না। গুণীরা দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও সুখে থাকত যদি সত্যিকার শ্রদ্ধা পেত। তাদের শ্রদ্ধাও করে না কেউ। আমার ক্লাসে সত্যিকার ভালো ছেলে ছিল মাত্র গুটিকয়েক। বাকী সব জানোয়ার। ক্লাসে বসে' সিটি মারত, শেয়াল কুকুরের ডাক ডাকত। কথায় কথায় স্ট্রাইক আর হুজুক। সুপারিশ করে নম্বর বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা, না বাড়িয়ে দিলে রাস্তায় ঘাটে অপমান, অনেক সময় প্রহারও। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় বা সিনেমা অভিনেতা তাদের কাছে যে খাতির পায় কোনও প্রথমশ্রেণীর অধ্যাপক তা পায় না। তাদের কাছে ভালো প্রফেসারের চেয়ে মন্দ প্রফেসারের দর বেশী। যে প্রফেসার তাদের সঙ্গে ইয়ার্কি করে, তাদের হৈ-হুল্লোড়ে মাতে, তাদের আবদার শোনে, নম্বর বাড়িয়ে দেয়, পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়, তারাই তাদের চোখে ভালো প্রফেসার। ছেলে-মেয়েদের বাপ-মায়েরাও চান না যে ছেলে মানুষ হোক, তাঁরা চান ছেলে পাস করুক। তাঁদের কাছেও ভালো প্রফেসারের কদর নেই। তাই ভালো ছেলেরা আজকাল প্রফেসারি লাইনে যেতে চায় না। তারা ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ার হচ্ছে, শাসন-বিভাগে বড় অফিসার হবার চেষ্টা করছে। ওই সব লাইনে গেলেই আজকাল কদর হয়, পয়সাও হয়।"

দ্বিজেনবাবু হেসে বললেন, "আপনি যা বললেন তা ঠিকই। দেশের অবস্থা সব দিক দিয়েই শোচনীয়, কিন্তু বিশেষ করে এই জন্যেই দেশের শিক্ষা-বিভাগে ভালো লোক থাকা দরকার।"

"কিন্তু আমাদের স্বাধীন গভর্নমেণ্টের যে রকম কাণ্ডকারখানা তাতে কোনও আত্মসম্মানী লোক শিক্ষা-বিভাগে থাকতে পারবে না—"

"সেই জন্মেই দেবেন গভর্নমেণ্ট সংস্পর্শবর্জিত স্কুল খুলছে একটা। আপনি শুনেছেন বোধহয়—"

"শুনেছি। কুসুম আমার কাছে এসেছিল। সে আমার মেয়ে উষাকে নিয়ে যেতে চাইছিল তাদের স্কুলে। কিন্তু আমার গিন্নী তাতে আপত্তি করলেন, আমারও মনে হ'ল ও পারবে না। ওর বিয়েই দিতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, কুসুম বলছিল আপনার জানা একটি ভালো পাত্র আছে নাকি? চাটুজ্যে তাদের উপাধি?"

দ্বিজেনবাবু দু'এক মিনিট ভ্রূকুঞ্চিত করে রইলেন। তারপর বললেন, "ও হ্যাঁ, আছে। গয়ার গিরিন চাটুজ্যের ছেলে। ছেলেটি খুব ব্রিলিয়াণ্ট নয়, একবার আই. এস-সি. ফেল করেছিল। এম. বি. বি. এস.ও বোধহয় একবারে পাস করতে পারে নি। তারপর গিয়েছিল বিলেত। সেখানেও বার দুই ঘোলটান খেয়ে শেষে এফ.আর.সি.এস.টা পাস করেছে। ভালো চাকরিও পেয়েছে একটা। তবে ওর কাঁধে লায়াবিলিটিও অনেক। দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী আছে। দুটি ভাইও এখনও স্কুলে পড়ছে। নিজেদের বাড়ি আছে অবশ্য। গিরিনবাবুরও টাকা আছে। আপনি যান না, দেখে আসুন। চিঠিপত্র লিখে সুবিধা হবে না। মেয়েকে যেখানে দিতে হবে সেখানে নিজে গিয়ে সব দেখে শুনে আসাই ভালো। গিরিন চাটুজ্যে লোক খারাপ নয়। আপনি বলেন তো আমি চিঠি লিখে দিতে পারি একটা।"

"ভদ্রলোক করেন কি?"

"বিড়ির ব্যবসা করেন। ওখানে পরিচিত মহলে উনি বিড়িবাবু

বলেই পরিচিত। বিড়ির ব্যবসা করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছে মশাই। একটু কনজুসও আছে। মোটর টোটর নেই, বাইরের কোন বহ্বাড়ম্বরও নেই। আড়ময়লা ফতুয়া গায়ে, পায়ে কেড্‌স-এর জুতো পরে' ছাতি ঘাড়ে নিয়ে পায়ে হেঁটেই বিশ্বজয় করে বেড়াচ্ছে। আলাপ করে আসুন।"

"বেশ তাই যাব—"

"কি নাগাদ যাবেন, আজই তাহলে চিঠি লিখে দি একটা—"

"এখান থেকে ফিরেই যাব। এই ধরুন, আগামী রবিবার—"

"বেশ। সেই রকমই লিখে দিচ্ছি তাহলে—"

হরমোহিনী অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। শুধু অবাক নয়, হতভম্ব। এতদিন ধরে' যে দুটো ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল সে দুটোই যে বানচাল হ'য়ে গেল। এরা চক্রবর্তী, কিন্তু কি ভদ্র এদের ব্যবহার, কি আভিজাত্যপূর্ণ আচরণ। এরা বাঙাল, কিন্তু বউদের খাটায় না তো। বউরা কুটোটি পর্যন্ত নাড়ে না। চাকর, রাঁধুনী, দাই, বেয়ারাতে বাড়ি ভরতি। অবাক কাণ্ড।

আঠার

গিরিন চাটুজ্যেও স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রজেনবাবু তাঁর বাড়িতে উঠলেন না। একটা হোটেলেই উঠলেন গিয়ে। তারপর স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে গেলেন তাঁর বাড়িতে। একটা রিক্‌শা করেই গেলেন। দেখলেন রিক্‌শাওলারাও তাঁকে বিড়িবাবু বলে' চেনে। কারণ যে লোকটি তাঁকে নিতে এসেছিল সে রিক্‌শাওলাকে কেবল বললে—'বিড়িবাবুকা মকান যানা হ্যায়।'

অমনি সে চলতে লাগল। হরমোহিনীর গোড়া থেকেই 'বিড়িবাবু' নামটা পছন্দ হয় নি। যেতে যেতে বললেন, "এখানে এসেছি যখন, তখন চল একবার দেখে আসি, কিন্তু এখানে মেয়ের বিয়ে দেব না। 'বিড়িবাবু' যার নাম তার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা যায় না কি ?"

ব্রজেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, "ইংরেজিতে একটা কথা আছে— What is in a name. অন্য সব দিকে যদি ভালো হয় নামে কিছু আসবে যাবে না।"

গলির গলি তস্য গলির মধ্যে একটি ত্রিতল বাড়ি। হঠাৎ মনে হয় যেন একটা খাঁচা, কিংবা বাড়ির কঙ্কাল। বাড়িতে বহুকাল রং পড়ে নি। বাড়ির সামনেই সারি সারি অনেকগুলো লোহার-গরাদ-দেওয়া জানালা। আশপাশে রঙের কোনও চিহ্ন নেই। বাড়ির দেওয়ালে শুকনো শ্যাওলার কালো দাগ। বিড়িবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুধু গা, পরনের কাপড়টা মনে হ'ল ন'হাতি। পায়ে জুতো নেই, খড়ম।

রিক্‌শা থামতেই সোচ্ছ্বাসে সম্বর্ধনা করলেন।

"আসুন, আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।"

ব্রজেন্দ্রবাবু চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল যেন একটা পাতিহাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে উঠল। মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে পাতিহাঁসের কণ্ঠস্বরের যে এতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে তা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল।

"আসুন আসুন ভিতরে আসুন। বল্‌ভদ্দরজী পাংখা খোল দিজিয়ে—"

তারপর হরমোহিনীর দিকে ফিরে বললেন—"মালক্ষ্মী, আপনি ভিতরে যান। ওগো এঁকে ভিতরে নিয়ে যাও।"

আধঘোমটা-দেওয়া একটি স্থূলাঙ্গিনী মহিলা ভিতর থেকে বাইরে

এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে হরমোহিনী অন্তঃপুরে চলে' গেলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন। বাইরের ঘরে একটি কাঠের টেবিল এবং তার দু'পাশে দুখানি কাঠের হাতল-হীন চেয়ার। দেওয়ালে একটি মাত্র ফোটো। সেটি বিড়িবাবুর। নামাবলী গায়ে, হাতে মালা, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত। টেবিলের উপর একটি মাত্র লাল মলাটের প্যামফ্লেটগোছের বই রয়েছে, তার উপরে প্রথমেই বড় দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা রয়েছে 'বিড়ি বার্তা', তার একটু নীচে ব্র্যাকেটের মধ্যে ইংরেজি ছোট অক্ষরে (Biri News)। ঘরে আর কোন আসবাব নেই।

বিড়িবাবু বললেন, "এইখানেই বসুন। আমার বন্ধু নবীনবাবু এখনই আসবেন। তাঁকেও আসতে বলেছি। বল্‌ভদ্দরজী—"

বল্‌ভদ্দরজী (বলভদ্রজী) বিড়িবাবুর চাকর।

"কহিয়ে—"

"আপ নবীনবাবুকো খবর দিজিয়ে যে ব্রজেন্দ্রবাবু আ গয়েঁ হেঁ।"

"তুরন্ত যাতা হুঁ। চায় কা পানি চঢ়া দিয়া উতারকে যায়েঙ্গে না?"

"ঠিক হ্যায়। উতারকে পাতৃতি ভিজাকে, তব যাইয়ে—"

ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল বল্‌ভদ্দরজী বোধহয় বিড়িবাবুর একমাত্র চাকর। বিড়িবাবু তার সঙ্গে এরকম সম্ভ্রমপূর্ণ ভাষায় কথাবার্তা কইছেন দেখে একটু বিস্মিত হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। যাই হোক বল্‌ভদ্দরজীকে আর যেতে হ'ল না, নবীনবাবু নিজেই এসে পড়লেন। সরু লিকলিকে চেহারা। মুখে ছুঁচলো পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর পাকা চুলে তেড়ি দেখে মনে হয় ভদ্রলোক এককালে শৌখিন ছিলেন। আড়ময়লা প্যান্টের উপর বুশশার্ট পরে' এসেছিলেন। বাঁ হাতটা উত্তোলন করে হাসিমুখে সম্বর্ধনা করলেন ব্রজেন্দ্রনাথকে।

তারপর হেসে বললেন, "দেখা হ'য়ে খুশী হলাম। আপনি শুনে সুখী হবেন, আমরা সবাই আপনার মিলেরই গেঞ্জি ব্যবহার করি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নবীনবাবুর বসবার চেয়ার ছিল না। বিড়িবাবু আবার তাঁর বল্‌ভদ্দরজীকে ফরমাশ করলেন—"বল্‌ভদ্দরজী, আউর এক কুরসী লে আইয়ে।"

টিনের একটি চেয়ার দিয়ে গেল সে।

ব্রজেন্দ্রনাথ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন বিড়িবাবুর সঙ্গে নবীনবাবুর চোখের ইশারায় কি যেন একটা কথা হ'য়ে গেল।

"জগুকে ফোন করেছিলেন নবীনবাবু?"

"করেছি। সে এক্ষুনি আসছে।"—এ কথা বলে' নবীনবাবু ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, "জগু হচ্ছে এঁর ছেলে, এখানকার হাসপাতালেই কাজ করছে এখন। হীরের টুকরো ছেলে—যদি ভগবানের ইচ্ছেয় আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা হয়—তখন দেখবেন—"

ব্রজেন্দ্রনাথ বিড়িবাবুকে প্রশ্ন করলেন—"ইনি কে, পরিচয় করিয়ে দিলেন না তো—"

প্যাঁক প্যাঁক করে উঠলেন বিড়িবাবু।

"আরে আরে মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে। ইনি নবীনবাবু, আমার বন্ধু, আমার দক্ষিণহস্ত। আমার ব্যবসায় দেখাশোনা করেন, তাছাড়া হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসও করেন। খুব হাতযশ। জগু যখন ইস্কুলে পড়ত, তখন উনি ওর প্রাইভেট টিউটারও ছিলেন। জগুকে আমার চেয়ে উনিই ঢের বেশী চেনেন। ওই রোগা চেহারা, কিন্তু ওস্তাদ লোক—"

ক্যাঁক ক্যাঁক করে হেসে উঠলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। এমন সময় ভিতর থেকে ডাক এল। বল্‌ভদ্দরজী এসে বললেন মাতাজি সকলকে

উপরে যেতে বলছেন। উপরে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন—সেকেলে চকমিলানো বাড়ি। দোতলার চারদিকে ফালি বারান্দা, সেগুলিও লোহার গরাদে দিয়ে ঘেরা। গরাদের উপর আবার ক্যাম্বিসের পরদা টাঙাবারও ব্যবস্থা আছে। ব্রজেন্দ্রনাথের আবার খাঁচার উপমাটা মনে পড়ল।

ওঁরা উপরে গিয়ে শোবার ঘরেই বিছানার উপর বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলভদ্দরজী তিনটি ছোট ছোট টেবিল এনে রাখল ঘরের ভিতর। চা এবং জলখাবার এল তার পর। প্রচুর জলখাবার। সিঙ্গাড়া এবং কচুরির বেয়াড়া সাইজ। এ ছাড়া মিষ্টিও অনেক রকম। মামুলী বিনয়-বচনের আদান-প্রদান হ'ল যথারীতি। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "এতো খেতে পারব না।"

বিড়িবাবু হাত কচলে কচলে হাসতে হাসতে বললেন, "সামান্যই তো দেওয়া হয়েছে। আপনাদের মতো লোককে খাওয়াবার সাধ্য কি আমার আছে!"

ব্রজেন্দ্রনাথ টেনিস বলের মতো কচুরিটি তুলে নিলেন এবং চা দিয়ে সেইটেই খেলেন কেবল। কচুরিটি ভালো, কিন্তু চা অত্যন্ত খারাপ। নবীনবাবু কিন্তু কিছু ফেললেন না। সব খাবারগুলি নীরবে খেলেন বসে বসে।

এর পরই জগু এসে পড়ল। কালো রং, রোগা, বেঁটে, মাথার সামনের দিকে চুল নেই। পরনে হাফশার্ট আর প্যাণ্ট। চোখে মুখে সপ্রতিভ সবজান্তা ভাব।

নবীনবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"ইনিই বিখ্যাত ব্রজেনবাবু, সুন্দর গেঞ্জি মিলের মালিক এবং সম্ভবতঃ তোমার উড-বি শ্বশুর—"

জগু একটু মুচকি হাসল শুধু। প্রণাম তো করলই না, নমস্কার

পর্যন্ত করল না। তার মুখে একটা মুরুব্বিসুলভ ভাব ফুটে উঠল বরং—ভাবটা যেন, ও আমাকে দেখতে এসেছে, ও, তা তো আসবেই। তারপর সে নবীনবাবুকে বলতে লাগল—কোথায় কোথায় তার চাকরির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কথা শুনে মনে হ'ল সবাই যেন তাকে চাকরি দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। নবীনবাবু তার কথা শুনতে শুনতে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে চাইতে লাগলেন, তাঁর দৃষ্টির অর্থ, শুনছেন ? শুনুন ! জগু নবীনবাবুকে শেষে বললে, "আপনার ফোন পেয়েই আমি এলাম। আমাকে এখুনি আবার চলে যেতে হবে। একটা স্ট্র্যাংগুলেটেড্ হার্নিয়া কেস এসে অপেক্ষা করছে। বোধহয় সেটাকে এখনই 'ওপ্ন্' করতে হবে। আমি চলি—"

এই বলে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা খেয়ে চলে গেল সে। বিড়িবাবু বললেন, "চলুন আমার বাড়িটা আপনাকে দেখাই।" ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখলেন বাড়িটা। সত্যিই বাড়িটি একটি খাঁচা বিশেষ। তেতলার বারান্দা থেকে উঠোনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যেন কুয়ার ভিতর উঁকি দিচ্ছেন। অনেকগুলি ঘর। কয়েকটি ঘরে বিড়ির পাতা, আর বিড়ির তামাক ঠাসা। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন, বাড়িতে একটি বই নেই। খবরের কাগজও না। একটি ঘরে দেখলেন একটি সুন্দরী মেয়ে একটি শিশু কোলে করে বসে আছে। ব্রজেন্দ্রনাথকে দেখে ঘোমটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিড়িবাবু বললেন, "এটি আমার ভাইপো-বউ।" ব্রজেন্দ্রনাথের মনে হ'ল যেন বন্দিনী হ'য়ে আছে। ফিরে আসবার মুখে বিড়িবাবু বললেন, "একটা কথা বোধহয় আপনি জানেন না। আপনার মেয়েকে আমরা দেখেছি—"

"কোথায়—"

"আপনি গতবার যখন দিল্লী একজিবিশনে গিয়েছিলেন, আপনার মেয়ে সঙ্গে ছিল তো ?"

"হ্যাঁ—"

"সেই একজিবিশনে আমি আর নবীনবাবুও ছিলাম—। মেয়ে আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে। আমার ছেলেকেও তো দেখলেন, এখন বাকি কথাবার্তাগুলো হ'য়ে গেলেই ব্যস—"

ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরে ফিরে এসে হেসে জিগ্যেস করলেন—"আপনার ডিমাণ্ড কি রকম—"

জিব কেটে বিড়িবাবু বললেন, "ছি, ছি, আপনার কাছে কি ডিমাণ্ড করতে পারি! আপনার যা খুশী দেবেন—"

নবীনবাবু একধারে একটু কাত হ'য়ে বসে একটা কাগজে কি কি যেন লিখছিলেন। লেখা শেষ করে বললেন, "ডিমাণ্ড আমাদের নেই। কিন্তু মেয়ে জামাইকে আপনি তো কিছু দেবেন? আপনার খ্যাতি আর মর্যাদা অনুসারে আপনাকেও কিছু দিতে হবে তো! তাই আপনার হ'য়ে আমি এই লিস্টটা তৈরি করছিলুম। এর ওপর আপনি যা বাড়াতে চান বাড়াবেন বা কমাতে চান তো কমাবেন।"

বিড়িবাবু প্যাঁক প্যাঁক করে বলে উঠলেন—"না, না, লিস্ট দেবেন না নবীনবাবু—"

মুখে একথা বললেন বটে, কিন্তু চোখ মুখের ভাবে যা প্রকাশ পেল তা অন্যরকম। মুচকি মুচকি হাসছিলেন তিনি।

নবীনবাবু বললেন, "আহা, এটা ওঁরই সুবিধের জন্য দিচ্ছি। জাস্ট ফর এ গাইডেন্স।"

ব্রজেন্দ্রনাথ কাগজটা নিয়ে দেখলেন নবীনবাবু ত্রিশ হাজার টাকার ফর্দ করেছেন।

হরমোহিনী কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিলেন।

রিক্শায় নীরবেই বসে রইলেন দুজনে পাশাপাশি। অবশেষে ব্রজেন্দ্রনাথই কথা বললেন, "এখানে বিয়ে দেব না।"

হরমোহিনী ছোট্ট উত্তর দিলেন—'রামোঃ।"

উনিশ

প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। এর আগে যে ক'জনকে চিঠি লিখেছিলেন তাদের কেউই আর উত্তর দিলেন না। ক্রমশঃ আবার হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনী কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। তিনি এসে একদিন কড়া তাগাদা দিলেন।

"তুমি বেশ হাল ছেড়ে বসে আছ তো। এভাবে বসে থাকলে চলবে কি। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো।"

"আমি কি করব বল। চিঠি তো লিখেছি কয়েক জায়গায়। উত্তর না এলে কি করতে পারি।"

"ছেলেদের চিঠি লেখ আবার। ওরা বড় হয়েছে, উপযুক্ত হয়েছে, ওরাই ভার নিক।"

"ওদেরও তো লিখেছি। ওরা কয়েকটি পাত্রের সন্ধান তো দিয়েও ছিল, কিন্তু তোমারই তো পছন্দ হ'ল না।"

"পছন্দ হবার মতো হলেই পছন্দ হ'ত। যার তার হাতে তো মেয়ে দিতে পারি না। না, না, অমন বসে থাকলে চলবে না। ছেলেদের আজই চিঠি লেখ ফের।"

"লিখব।"

তিন ছেলেকেই আবার চিঠি লিখলেন তিনি।

অন্যান্য কথার পর লিখলেন, "উষার বিয়ের তো কোথাও ঠিক করতে পারলাম না এখনও। তোমরাও তো কিছু চেষ্টা করছ না।

পাত্র নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এ কাজ তোমাদেরই। তোমার মা ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। তাগাদার জ্বালায় জীবন দুর্বহ করে তুলছেন আমার। আজকাল অবশ্য মেয়েদের অনেক বয়সে বিয়ে হচ্ছে। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মেয়ে তো ঘরে ঘরে। সে হিসেবে উষার এমন কিছু বয়স হয় নি। কিন্তু তোমার মায়ের আর তর সইছে না। আমাকে ক্রমাগত খোঁচাচ্ছেন। কিন্তু আমি কি করব বল, চেষ্টার ত্রুটি করছি না। কষ্ট করে পূর্ণিয়া আর গয়ায় গিয়েছিলাম তোমার মাকে নিয়ে। হ'ল না। সবই অদৃষ্ট—"

তিন ছেলেকে একই চিঠি লিখলেন।

ছেলেদের চিঠি লেখার দিন দুই পরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু শিবেন দত্তের চিঠি পেলেন। অনেকদিন আগে তাঁকেও চিঠি লিখেছিলেন উষার জন্যে পাত্র সন্ধান করতে। শিবেন তাঁর সহপাঠী ছিলেন। প্রফেসারি করতেন। এখন রিটায়ার করে ফার্মিং করছেন। নানারকম খবর টবর রাখেন। বেশ মার্জিতরুচি লোক। অনেকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। কিন্তু উত্তর পান নি। হঠাৎ তাঁর চিঠি এসে হাজির হ'ল।

ভাই ব্রজ,

নিশ্চয়ই চটে আগুন হ'য়ে আছ। তোমার চিঠির উত্তর অনেক আগেই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভাই মনই চিঠির উত্তর দেয়, হাত বা কলম নয়। মনই ব্যাপৃত ছিল অন্যত্র। এতদিনে তার ছুটি হয়েছে। তুমি আমাকে তোমার কন্যাদায়ের সমস্যা সমাধান করতে বলেছ। প্রথমতঃ আমার মনে হয় ওটা

কোনও সমস্যাই নয়, আমরা নিজেরাই ওটাকে সমস্যা বানিয়েছি, নিজেদের স্বার্থের জন্যে এবং নিজেদের অহংকার-তৃপ্তির বাসনায়। আমাদের ইচ্ছা আমরা মেয়েকে যতদূর সম্ভব কম খরচে যতদূর সম্ভব ভালো পাত্রে সমর্পণ করব, যদি তার জাত কুল কুষ্টি আমাদের মজ্জাগত কুসংস্কারের অনুকূল হয়। এই অস্বাভাবিক সমস্যার কোন স্বাভাবিক সমাধান নেই। ওটা অনেকটা জিগ্‌শ পাজ্‌লের মতো। যদি মিলে যায় তো ভালই, যদি না মেলে ধৈর্য হারালে চলবে না।

আমাদের দেশে আগে মেয়ে বিক্রি হ'ত। অন্যান্য রত্নের মতো কন্যা-রত্নেরও কেনা-বেচা চলত। তার বাজার-দরও ভালো ছিল। এখনও এদেশের অনেক সমাজে কন্যা বেচা-কেনা চলছে। আমাদের সমাজে এর চেয়েও ঘৃণ্য ব্যবসা চলছে আজকাল। মেয়েকে সাময়িকভাবে বিক্রি করে অনেক পিতামাতা নিজেদের সংসার চালাচ্ছেন। স্ত্রীকে বিক্রি করতে বা সাময়িকভাবে ভাড়া দিতে অনেক স্বামীরও দেখছি আপত্তি নেই।

আমরা, মানে তথাকথিত সদ্‌ব্রাহ্মণেরা, মেয়েদের বিক্রি করতে চাই নি, দান করতে চেয়েছিলাম কুলীনবংশোদ্ভব সৎপাত্রের হাতে। দানের সঙ্গে দক্ষিণা দিতে হয়। ক্রমশঃ ওই দক্ষিণার পরিমাণটা বাড়তে বাড়তে 'পণে' রূপান্তরিত হয়েছে, কন্যারাও আর রত্ন নেই, হয়েছেন গলগ্রহ। কুলীনদেরও রূপান্তর ঘটেছে। নবধা-কুল-লক্ষণ-যুক্ত কুলীনদের সমাজ-কৌলীন্য এখন আর নেই, এখন অর্থ-কৌলীন্যই একমাত্র কৌলীন্য। এখন আচার বিনয় বিদ্যা নয়, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়ি গাড়ি—এই সবেরই কদর বেশী। আমরা দুরকম কুলীনকেই একপাত্রে চাইছি। তা কি

পাওয়া যায়? সোনার পাথরবাটি কবিকল্পনাতেই সম্ভব। যুগ বদলাচ্ছে, তোমাকেও বদলাতে হবে।

আমার জানাশোনা একটি পাত্র আছে। ছেলেটি বারেন্দ্র। শাস্ত্রের মানদণ্ডে নিখুঁত কুলীন হয়তো নয়, একটু-আধটু খাদ আছে, কিন্তু ছেলেটি ভালো। সুরূপ, বিদ্বান এবং ভালো চাকরিও করে। মেকানিকাল ইন্‌জিনিয়ার। তার বাপও গভর্নমেণ্ট প্লীডার ছিলেন, প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন, কিন্তু আটটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, অনেক রুধির ক্ষয় হয়েছে। সম্প্রতি কিছু হীনবল। ওই ছেলেটিই তাঁর একমাত্র ছেলে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, আমি ওঁদের বলতে পারি। আমাকে খাতির করেন। পণ হয়তো কিছু দিতে হবে কিন্তু কচ্ছপের কামড় আছে বলে মনে হয় না।

আর একটি পাত্র আছে, সেটি কায়স্থ, আমারই বড় ছেলে। সে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা তো আছেই, কুটুম্বিতা হ'লে আরও সুখী হব। ছেলের মত আছে। পণের কোনও দাবি নেই। তবে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। আমার বড় মেয়ে বিয়ে করেছে একজন ব্রাহ্মণের ছেলেকে। লাভ ম্যারেজ। আমি কোনও আপত্তি করি নি, যুগের হাওয়াকে মেনে নিয়েছি।

এই প্রসঙ্গে বিপত্নীক নিকুঞ্জবাবুর কথা মনে পড়ছে। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। দেখতে পরী নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। তার নামে যখন বার বার প্রেমপত্র আসতে লাগল তখন বিব্রত হ'য়ে পড়লেন ভদ্রলোক। একবার একজন প্রণয়ীকে ধরেছিলেন তিনি। তাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তুমি কি একে বিয়ে করবে? সে বললে, বিয়ে? আচ্ছা বাবাকে জিগ্যেস করে আসি।

প্রেম করবার আগে বাবাকে জিগ্যেস করবার প্রয়োজন অনুভব করে নি ছোকরা। বলা বাহুল্য, কাপুরুষটা আর ফিরল না।

নিকুঞ্জবাবুর বিপদ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বাড়িতে স্ত্রী নেই, তাঁকেই মেয়ে পাহারা দিতে হ'ত। সুসভ্য বাংলাদেশের মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে নির্ভয়ে বেরুনো যায় না। খবরের কাগজে প্রত্যহ যে সব খবর বের হয় (সম্ভবতঃ সেগুলি সত্য খবর) তা পড়লে বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়।

নিকুঞ্জবাবুর পৈতৃক অর্থ ছিল কিছু, ব্যাঙ্কে ফিক্স্‌ড্ ডিপজিট। তার সুদ পেতেন এবং ঘরে বসে টাইপ করতেন। ভাঙা টাইপরাইটার একটা ছিল তাঁর। তাঁর দু'একজন হিতৈষী বন্ধু তাঁর টাইপের কাজ যোগাড় করে দিতেন। আমিও তাঁকে দিয়ে আমার থীসিস্‌টা টাইপ করিয়েছিলাম। নির্ভুল টাইপ করতেন। পিতাপুত্রীর গ্রাসাচ্ছাদন কোনক্রমে চলত এই সামান্য আয় থেকে। কিন্তু মেয়ের বিয়ের খরচ জোটানো সম্ভবপর ছিল না। মেয়েকে বাড়িতেই পড়াতেন তিনি। প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাসও করেছিল মেয়েটি। শেষকালে মরিয়া হ'য়ে এক অসমসাহসিক কাজ করে বসলেন নিকুঞ্জবাবু।

স্ত্রী ছিল না বলেই বোধহয় পেরেছিলেন, স্ত্রী থাকলে পারতেন না।

তিনি এক ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন। সারমর্ম হচ্ছে—আমার একটি আঠারো বছরের মেয়ে আছে। মেয়েটি রূপসী নয়, কুৎসিতও নয়। স্বাস্থ্যবতী। যে-কোনও জাতের এবং যে-কোনও প্রদেশের ভদ্র ছেলের হাতে আমি এ মেয়েকে সম্প্রদান করতে রাজী আছি, যদি তিনি মেয়েটিকে বিনাপণে গ্রহণ করতে সম্মত থাকেন।

কোনও বাঙালী যুবক এগিয়ে এল না। তারা প্রেম করতে প্রস্তুত, বিয়ে করবার তাগদ নেই।

এগিয়ে এলেন একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ভারত গভর্নমেণ্টে পদস্থ অফিসার একজন। বিনা আড়ম্বরে বিয়ে হ'য়ে গেল। তারা এখন সুখে আছে। খবর নিয়েছি মেয়েটির দুটি ছেলে হয়েছে। নিকুঞ্জবাবু কন্যাদায়মুক্ত হয়েছেন। আমি এই ধরনের আরও খবর জানি। ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করেছে সোনার-বেনে। বাঙালী হিন্দু মেয়েকে প্রেম করে' বিয়ে করেছে মুসলমান, পাঞ্জাবী এবং সিন্ধি।

তোমাকে এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য—যুগ বদলেছে, তুমিও বদলাও। যে জাত নেই সে জাত আঁকড়ে থেকো না। নূতন জাত তৈরি কর।

তোমার পত্রের আশায় রইলাম। ভালবাসা জেন। ইতি—

তোমারই

শিবেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

ভাই শিবেন,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলাম। তুমি যা লিখেছ সবই ঠিক। তোমার সঙ্গে আমার মতের কিছু অমিল নেই। আমার একার মতে যদি বিয়ে হ'ত তাহলে আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী হতাম। কিন্তু বিবাহ সামাজিক ব্যাপার। বিশেষ করে যে ব্যক্তিটির সঙ্গে এর সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই ব্যক্তিটিরই এতে আপত্তি। আমার মেয়ে অসবর্ণ বিবাহে রাজী নয়, যে নিয়ম আমাদের পরিবারে চিরাচরিত তার বাইরে সে যেতে চায়

না। আমার স্ত্রী তো চানই না। সুতরাং আমি ভাই নাচার। আমার ভালবাসা জেন। ইতি—

তোমার

ব্রজেন্দ্রনাথ।

দিনকয়েক পরে কুসুমিকারও চিঠি এল একটি।

শ্রীচরণেষু,

কাকাবাবু, প্রায় মাস তিনেক আপনাদের চিঠি পাই নি। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। কাল দ্বিজেনকাকার একটা চিঠিতে জানলাম আপনারা পূর্ণিয়া গিয়েছিলেন। দ্বিজেনকাকার কাছে পাত্রের সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে কি হ'ল ? জানাবেন। আমি কলকাতায় আর একটি পাত্রের খবর পেয়েছি। পাত্রটি ইন্‌জিনিয়ার। তার বাবা বড় উকীল। নীচে ঠিকানা দিলাম। আপনি তাঁকে চিঠি লিখে দেখুন। আমাদের স্কুল আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পাকা বিল্ডিং এখনও হয় নি। বাবা খুব বড় বিল্ডিং করতে চাইছেন না। ছোট পাকা বাড়ি পরে হবে। এখন আমরা মাটির ঘরেই স্কুল শুরু করে' দিয়েছি। এখানে অন্য কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগছি। এখানে আর একটা অসুবিধা, বড্ড সাপ। গোখরো সাপ। তিন চারটে মারা হয়েছে। আপনাদের খবর দেবেন। বাবার শরীরও ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর উৎসাহ খুব। আপনি ও কাকীমা আমার প্রণাম নিন। ইতি—

প্রণতা

কুসুমিকা।

কুড়ি

ব্রজেন্দ্রনাথের তিন ছেলেই কলকাতাতে ছিল। বাবার এবং মায়ের চিঠি পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ল সবাই প্রথমটা। নরেন বলল, "বাবা কেন যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন তা তো বুঝি না। ব্যস্ত হলেই তো পাত্র জুটবে না—"

বরেন হেসে বলল, "বাবার চেয়ে মা-ই বেশী ব্যস্ত হয়েছেন। আর তিনিই ব্যস্ত করে তুলছেন বাবাকে—"

হরেন প্র্যাক্টিকাল লোক। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, "বিজ্ঞাপন না দিলে পাত্রের খবর পাওয়া যাবে না। আমরা রাস্তায় রাস্তায় কোথায় পাত্র খুঁজে বেড়াব। সব কাগজগুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলা যাক পোস্ট বক্সের নম্বর দিয়ে। খবর এলেই বাবাকে ঠিকানা পাঠানো যাবে। তারপর তিনি চিঠি লিখে ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া তো অন্য কিছু আমার মাথায় আসছে না—"

বরেন বলল, "হ্যাঁ, ওই ব্যবস্থাই ভালো। তাছাড়া আর একটা জিনিস করা দরকার। এদের সবাইকে বাবা মার কাছে পাঠিয়ে দাও—"

"এদের মানে ?"

"বউদিকে, শিউলিকে আর অরুণাকে।"

"তাতে লাভটা কি হবে ?"

"ওরা গেলে বাবা মা দুজনেই অন্যমনস্ক থাকবেন। যতদূর বোঝা যাচ্ছে ওঁদের এই ছটফটানির আসল কারণটা উষার বিয়ে নয়, আসল কারণ হাতে কোন কাজ নেই। এরা গেলে হাতের এবং মনের আর অবসর থাকবে না। বিশেষতঃ জিরে, মৌরি আর লবঙ্গ গেলে বিয়ের কথা চাপাই পড়ে যাবে।"

জিরে নরেনের ছেলে, মৌরি তার মেয়ে। লবঙ্গ বরেনের মেয়ে। হরেনের ছেলে মেয়ে হয় নি এখনও। অরুণার বয়স মাত্র কুড়ি। বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর আগে।

তাই ঠিক হ'ল।

এই উপলক্ষে বউদের মধ্যে গোপন যে কথাবার্তা হ'ল তা উপভোগ্য। তিনজনই লেখাপড়া-জানা আধুনিকা।

নরেনের বউ রূপ-রেখা মুচকি হেসে বরেনের বউ শিউলিকে বলল, "আমরা কেন যাচ্ছি জানিস? পীস্ মিশনে। বাবা কেনেডি, মা ক্রুশ্চেভ, আমি ম্যাকমিলান, তুই দি গ্যল, আর ছুটকি আডেনয়ার—"

শেফালি হেসে লুটোপুটি।

"যুদ্ধটা কার সঙ্গে কার?"

"যুদ্ধ এখনও বাধে নি। সমস্যা নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে—"

"সেটা কার কাছে বেশী?"

"এখনও বোঝা যাচ্ছে না সেটা—। বোধ হয় মা—"

অরুণা মুচকি হেসে বলল, "বেশ বোঝা যাচ্ছে মূর্তিমতী নিউক্লিয়ার এনার্জি হচ্ছে উষা।"

"ঠিক বলেছিস, কোন্ দিক দিয়ে যে ফেটে পড়বে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

তিনজনেই আবার হেসে উঠল।

একুশ

তিন বউ একসঙ্গে এল না।

প্রথমে এল বড় বউ। সঙ্গে জিরে আর মৌরি। আসার আগে নরেনের ছোট একটা চিঠি—"বড় বউকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের

কাছে। ওর শরীরটা এখানে খুব ভালো থাকছে না। প্রায়ই অম্বল হয়। ওখানকার জলহাওয়া ভালো, হয়তো উপকার হতে পারে। পাত্রের সন্ধান পেলেই আপনাকে জানাব। প্রণাম নেবেন।"

চিঠি পড়ে হরমোহিনী মন্তব্য করলেন—"অম্বল হবে না? যা লঙ্কা খাওয়ার ধুম। জিরে আর মৌরিকেও ওই মসলা-গরগরে তরকারি খাওয়ায়—"

ব্রজেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বললেন, "ওদের নামকরণই করেছে মসলার নামে। মসলা-প্রীতি ওদের অসাধারণ।"

রূপ-রেখা যখন এল তখন কিন্তু তার চেহারায় কোনও রোগের লক্ষণ দেখা গেল না। ঢলঢলে মুখখানি ঠিক তেমনি ঢলঢলে আছে। রূপ-রেখা গৌরাঙ্গী নয়, শ্যামা। কিন্তু তার মুখশ্রী অপরূপ। তার রূপ একটুও কমে নি, বরং বেড়েছে। হরমোহিনী কিন্তু ছাড়লেন না, তাঁর মনে হ'ল বাইরের ও রূপ ওপর-চকচকে রূপ। ভিতরে ভিতরে সর্বনাশা ডিসপেপসিয়া ওকে জীর্ণ করছে।

বললেন, "এখানে শরীর সারতে এসেছ, খাওয়া-দাওয়ার একটু ধরা-কাট কোরো। জিব সামলাতে না পারলে পেটের অসুখ সারে না।"

রূপ-রেখা আকাশ থেকে পড়ল।

"শরীর তো আমার খারাপ হয় নি। যা খাই বেশ হজম হয়। এখানে এসেছি এমনি বেড়াতে। কলকাতার ওই একঘেয়ে জীবন ভালো লাগছিল না। তাই চলে এলাম।"

"নরেন তবে যে লিখেছে তোমার প্রায়ই অম্বল হয়—"

"না তো। ওটা ওঁর নিজেরই বাই। নিজেরই অম্বল হয়, আঝালা সিদ্ধ তরকারী খান, ওষুধ তো লেগেই আছে, তবু অম্বলের কমতি নেই—"

রূপ-রেখা ফিক করে হেসে ফেললে।

জিরে চোখ বড় বড় করে বলল, "জান ঠা'মা, আমাকে বাবা একৃতা হাতী কিনে দিয়েছে। এত্তো বলো তাল শুঁল—"

মৌরি একটু বড়। তার কথা পরিষ্কার হয়েছে।

"কি যে বোকা জিরেটা! অত বড় শুঁড় কি করে হবে। হাতীটাই তো এত্তো টুকু। বড় বরং আমার পুতুলটা। শুইয়ে দিলেই চোখ বুজে ফেলে—"

জিরে আবদার ধরল—"ঠা'মা, আমাকেও ওই রকম পুতুল কিনে দাও না একটা—"

হরমোহিনী আর রূপ-রেখার অসুখের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলেন না। নাতি-নাতনীর সমস্যা নিয়ে পড়তে হ'ল। কারণ মৌরিও পরক্ষণেই বলল, "আমাকেও তাহলে হাতী কিনে দিতে হবে। ওর চেয়ে বড় হাতী। অনেক অনেক বড়—"

"সব হবে সব হবে—"

নাতি-নাতনীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেরিয়ে গিয়ে দেখলেন রূপ-রেখা কলের ময়দা নিয়ে মাখতে বসেছে। সে বড় বউ, এ বাড়িতে বেশ কিছুদিন এসেছে, সে জানে এ বাড়িতে অধিকার সাব্যস্ত করতে হ'লে অনুমতির অপেক্ষা চলে না। সে স্বল্পভাষিণী কিন্তু শক্ত মেয়ে। যা করবার তা সে করবেই। তার চরিত্র তার হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস কারফরমা ভালো করেই জানতেন।

"হঠাৎ ময়দা বার করে বসলে যে বউমা ?"

রূপ-রেখা বলল, "বাবা বললেন, আমার হাতের নিমকি খাবেন। লেবুর রস দিয়ে নিমকি করব আজ।"

"ভীমরতি ধরেছে তোমার বাবার। ডাক্তাররা ঘিয়ের খাবার ওঁকে খেতে বারণ করেছে জান ?"

"দু'একখানা খেলে আর কি হবে।"

আসলে নিমকি খেতে চেয়েছিল ঊষা। বলেছিল, "বউদি তুমি যে সেই নেবু দিয়ে নিমকি করেছিলে, কি চমৎকারই যে হয়েছিল। আবার কর না—"

রূপ-রেখা সোজা চলে গিয়েছিল ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে।

"বাবা, আপনার জন্যে নিমকি করব ?"

"হ্যাঁ বেশ তো। তোমার হাতে নিমকিটা ওতরায় ভালো—"

ব্যস, রূপ-রেখা সোজা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ময়দা বার করে মাখতে বসে গেল। হরমোহিনী থ' হয়ে গেলেন। কি কাণ্ড আজকালকার মেয়েদের! কারু তোয়াক্কাই করে না।

শিউলি এল দিন চারেক পরে। হঠাৎ এল, চিঠিপত্র না দিয়েই। রূপ-রেখা ছাড়া সবাই বিস্মিত হ'য়ে গেল।

"কি মজা, কি মজা! মেজ বৌদিও এসে গেছে। এবার চল একদিন বাগানে পিকনিক করে আসা যাক—" লাফিয়ে উঠল ঊষা।

হরমোহিনী শিউলিকে তুই-তোকারি করেন।

"তুই হঠাৎ চলে এলি যে—"

শিউলি সদা হাস্যমুখী। এই কথায় সে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ল একেবারে। আসল কারণটা সে যেন আর চেপে রাখতে পারছিল না। পারলও না শেষ পর্যন্ত। বলল, "উনি বললেন বাবা মা ঊষার বিয়ের জন্যে ভারী ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, তুমি গিয়ে সামলাও ওঁদের।"

হরমোহিনী তাঁর বাঁ গালের উপর বাঁ-হাতটি রেখে ঘাড়টি কাত করে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "তোমাদের খুরে খুরে পেন্নাম! আমরা কি কচি ছেলে যে সামলাতে এসেছ ? আসল

কাজের বেলায় তো সব নবডঙ্কা। যে পাত্রটির খবর দিয়েছিলে সেটি তো খবর নয়, গুজব। তাই বিশ্বাস করে চিঠি লেখালেখি করে হয়রান হলুম আমরা। ওগো শুনছো, ইনি এসেছেন আমাদের সামলাতে—"

রূপ-রেখা তখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ল। গম্ভীরভাবে শিউলিকে ধমক দিয়ে বলল, "কেন মিছে কথা বলছিস? তুই তো পালিয়ে এসেছিস স্যাকরার তাগাদার ভয়ে। জানেন মা, ও লুকিয়ে একটা হার গড়িয়েছে, তার 'বানি' দিতে পারে নি এখনও। সেই ভয়ে পালিয়ে এসেছে—"

শিউলি আবার একবার হেসে লুটিয়ে পড়ল। সত্যিই সে হার গড়িয়েছিল একটা আর সত্যিই তার 'বানি' বাকি আছে। গয়নার নামে হরমোহিনী এই বুড়োবয়সেও উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন।

বললেন, "হার গড়িয়েছিস নাকি? ভালই করেছিস। কই দেখি কি রকম হার—বাঃ, বেশ সুন্দর প্যাটার্ন তো। কত বানি চেয়েছে—"

"একশ' টাকা—"

"সে আমি দিয়ে দেব'খন"—হঠাৎ খুব প্রসন্ন হ'য়ে গেলেন তিনি। হারটি উলটে পালটে দেখতে লাগলেন।

শিউলির মেয়ে লবঙ্গর সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথেরই ভাব বেশী। সে গিয়ে তাঁর কোল দখল করে বসেছিল এসেই।

অরুণাও যখন দিন সাতেক পরে এসে গেল, তখন হরমোহিনীর মনে সন্দেহ হ'ল ভিতরে একটা নিগূঢ় ব্যাপার আছে কিছু। এরকম একজোট হ'য়ে সবাই চলে এল এর মানে কি। অথচ ঘরের বউ, তারা এসেছে, তা নিয়ে বেশী আলোচনা করাটা একটু অশোভন।

ওরা ভাববে—ওরা যে কি ভাববে, কি যে না ভাববে—তা হরমোহিনীর কল্পনার অতীত। আজকালকার মেয়েদের কাণ্ডকারখানা দেখে হরমোহিনী উত্তরোত্তর বিস্মিতই হচ্ছেন। কোন কূলকিনারা পাচ্ছেন না। সেকালে কি বউরা এমন 'ছুট্' করে নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যেতে পারত? এখনকার বউরা পারে। পারবে না কেন? ছেলেরাই যে কমজোর হ'য়ে গেছে সব। আজকাল বউরা তাদের ইয়ার। ইয়ারের উপর জোর চলে না। ঘোড়া বোঝে তার পিঠের সওয়ার কি রকম। সেই ভাবেই চলে। আর শাশুড়ীদের তো আজকাল কিছু বলবার জো নেই। নিজের মান বাঁচিয়ে মুখটি বুজে সব সহ্য করতে হয়। কিছু বললেই অশান্তি। হরমোহিনীর এসব চিন্তা নিতান্তই ব্যক্তিগত। মুখে ফুটে এসব কথা বলেন না কাউকে। এমন কি ব্রজেন্দ্রনাথকেও নয়। তিনি জানেন, বলে লাভ নেই। স্রোতের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। মাঝ থেকে অশান্তি হবে কেবল।

অরুণা যদিও বউদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট তাকেই কিন্তু মনে মনে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন হরমোহিনী। ইংরেজিতে এম. এ. পাস। দেখতে সুন্দরী। ভারী গম্ভীর। হরমোহিনী ওর সঙ্গে বেশ সহজ হ'তে পারেন নি। আড়াল থেকে ওর হাবভাব যা লক্ষ্য করেছেন তাতে তাঁর মনে হয়েছে মাথায় ছিট আছে মেয়েটির। বারবার আয়নায় মুখ দেখে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই হাসে। ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তার হাসিমুখটা কেমন দেখাচ্ছে। গুনগুন করে গান গায় আপনমনে। আপনমনে কথাও বলে। একা একা কথা বলে, কিন্তু লোকের সামনে একদম চুপ। হরমোহিনীকে শ্রদ্ধাযত্নও যে না করে তা নয়। বাইরে খুবই কেতা-দুরস্ত। কিন্তু হরমোহিনীর মনে হয় ও সবই যেন বাইরে-বাইরে, যা উচিত যা কর্তব্য

তা করে যাচ্ছে কেবল। ঠিক প্রাণের যোগ নেই। শিউলির যেমন আছে। শিউলি আলবিড্ডে, অগোছালো, হি হি করে হেসে মরছে, ওর শত দোষ, ও কিন্তু ভালবাসে হরমোহিনীকে। ভারী সরল মেয়েটা। অরুণা সে রকম নয়। অরুণা স্বতন্ত্র, ছিমছাম, যেন ভিন্নলোকবাসিনী।

ও এসে যা বললে তাতে অবাক হ'য়ে গেলেন হরমোহিনী। বলল, "বাবার কাছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়ব বলে এসেছি।"

শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে'? সংসার ফেলে চলে এসেছে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে বলে'? আর হরেন তাতে আপত্তি করে নি! ধন্যি আজকালকার ছেলে-মেয়েরা। সে ঠাকুরের রান্না খাবে, আর বউ এসে শেক্‌স্‌পীয়র পড়বে? আর ব্রজেন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখেও অবাক হ'য়ে গেছেন তিনি। ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধির উপর তাঁর কোন-কালেই আস্থা নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি হকচকিয়ে গেছেন একেবারে। তিনিও এই বুড়োবয়সে পুরোনো বইপত্র বার করে শেক্‌স্‌পীয়র নিয়ে মেতে উঠলেন। কি কাণ্ড!

ঊষা মেতে উঠেছে পিকনিক নিয়ে। রূপ-রেখা আর শিউলিও। হরমোহিনী এখনও মরেন নি, কিন্তু রূপ-রেখা এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন সে-ই এ বাড়ির কর্ত্রী। হরমোহিনীর মত না নিয়েই পিকনিকের জায়গা ঠিক হ'য়ে গেছে, 'মেনু' ঠিক হ'য়ে গেছে, কি কি হবে তা ঠিক হ'য়ে গেছে, ভাঙা গ্রামোফোনটা সারানো হ'য়ে গেছে—এখন সবাই মিলে ধরেছে হরমোহিনীকে পায়েস আর চাটনি করতে হবে। ওতুটো জিনিস নাকি ওঁর মতো কেউ রান্না করতে পারে না। ব্রজেন্দ্রনাথই নাকি ভিতরে ভিতরে উসকে দিয়েছেন ঊষাকে, তোর মাকে বল ওই তুটোর ভার নিতে। আমার ডায়েবিটিসের কারণ ওঁর

রান্না পায়েস। হরমোহিনীর হাসিও পায়, দুঃখও হয়। আশকারা দিয়ে দিয়ে এদের যে কোথায় উনি নিয়ে যান, কতদূর পর্যন্ত যে ওদের দৌড়, সেইটিই তিনি দেখতে চান কেবল।

তিন বউয়ের চক্রান্ত সফলই হয়েছিল বলতে হবে। কারণ মাসখানেক সত্যিই তারা এমন হৈ হৈ করেছিল যে উষার বিয়ের কথা নিয়ে আর মাথা ঘামাবার সময়ই পান নি ব্রজেন্দ্রনাথ বা হরমোহিনী।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের উত্তর এসেছিল অনেক। তিন ছেলে সে সব ঠিকানা পাঠাতে লাগল ব্রজেন্দ্রনাথকে। তিনি আবার চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

বাইশ

ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠির যে সব জবাব আসতে লাগল তা নিম্নলিখিত প্রকার :

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হয়েছি। আপনার সঙ্গে যদি পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হয় তাহলে তা বিশেষ আনন্দের হবে। আমার পুত্রটি বিবাহযোগ্য। লণ্ডন থেকে বি. এস-সি. পাস করেছে। বয়স ঠিক পঁচিশ বছর। এখন সে বাড়িতে বসে' আছে। কিন্তু কাজ শীঘ্রই পাবে। অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছে, দু'এক জায়গায় ইন্‌টারভিউও দিয়ে আসছে। একটি কথা জানানো দরকার মনে করি। আমার ছেলেটি উগ্ররকম ফরসা। আমার ইচ্ছা এবং আমার স্ত্রীরও ইচ্ছা

মেয়েটি যাতে গৌরাঙ্গী এবং সুশ্রী হয়। আপনি তার চেহারার বিশেষ বিবরণ পাঠাবেন। প্রীতি ও নমস্কার গ্রহণ করুন। ইতি—

মাননীয় ব্রজেন্দ্রবাবু,

আপনার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হ'ল, তার জন্যে মার্জনা করবেন। আমি যখন আপনার বিজ্ঞাপন দেখে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, তখন আমার ধারণা ছিল যে আমার ভাগিনেয় বিবাহে সম্মত আছে। কিন্তু এখন দেখছি বিপরীত। সে ডি. এস-সি.-র জন্য রিসার্চ করছে। সেটা শেষ না হ'লে বিবাহ করবে না। আমি তার মত করাবার জন্যে তার কর্মস্থানেও গিয়েছিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী নয়। অতএব আমার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও এ বিষয়ে উপস্থিত অগ্রসর হওয়া গেল না। ক্ষমা করবেন। ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৩।৪ তারিখের চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি। আপনি স্বনামধন্য পুরুষ, আপনার পরিচয় দরকার হয় না। আপনি আপনার কন্যার যে ঠিকুজিটি পাঠাইয়াছেন, তাহা একাধিক জ্যোতিষীকে দিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু মিল কিছুতেই হইল না। সুতরাং বুঝিলাম আপনার সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন বিধাতার অভিপ্রেত নয়। আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার পত্র পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার ছেলে এবার আই. এ. এস. পরীক্ষায় পাস করিয়াছে

তাহা ঠিক, কিন্তু সে এখন বিবাহ করিতে চায় না। তাহার বয়সও অল্প। মাত্র তেইশ বছর কয়েক মাস। আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে চিঠি লিখিয়াছিলেন আমার স্ত্রী। তিনি অবশ্য ছেলের বিবাহ দিতে উৎসুক। কিন্তু ছেলে বলিতেছে এখন বিবাহ করিবে না। প্রীতি ও নমস্কার জানিবেন। ইতি—

মান্যবরেষু,

আপনার ১৪।৪ তারিখের পত্র পাইয়াছি। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বিবাহিত। তৃতীয় পুত্র সুইজারল্যাণ্ড হইতে টি. বি. স্পেশালিস্ট হইয়া ফিরিয়াছে। ভালো হাসপাতালে বড় চাকুরি পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমার তিনটি কন্যা এখনও অবিবাহিতা। তাহারা সকলে স্কুলে মাস্টারি করে। আমার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্রবধূও চাকুরিস্থ। আজকাল মেয়েরা চাকরি না করিলে সংসার চলে না। আমার তৃতীয় পুত্রের ইচ্ছা তাহার বউও চাকরি করুক। ইহাতে আপনার মত আছে কি না জানাইবেন। নমস্কার লইবেন। ইতি—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। জ্ঞাতার্থে জানাই যে আমার ছেলেটি বি. কম. ফেল। কোথাও তাহার চাকুরি জুটাইতে পারি নাই। এখন ভরসা তাহার স্ত্রীর ভাগ্যে এবং শ্বশুরকুলের সহায়তায় যদি কোথাও জোটে। আমি সরল মানুষ। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আমার ছেলের যদি কোন চাকুরির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন, এক্ষুনি আমি রাজী হইব। কথাটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার দুটি অবিবাহিতা কন্যা আছে। স্ত্রী

রোগবশতঃ কর্মপটু নহেন। যদি আপনার কন্যা আমার গৃহে পুত্রবধূরূপে আসেন তাঁহাকে সংসারের ভারও লইতে হইবে। সব কথা খুলিয়াই লিখিলাম। আগেই সব খোলসা হইয়া যাওয়া ভাল। আপনার পত্রের আশায় রহিলাম। নমস্কার জানিবেন। ইতি—

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পাইলাম। আজকাল সৎপাত্র যেমন দুর্লভ, সৎপাত্রীও তেমনি। আমার ছেলেটি এম. এস-সি. পাস করিয়া রিসার্চ করিতেছে। বয়স প্রায় বত্রিশের কাছাকাছি। অনেক সন্ধান করিয়াও তাহার জন্য এযাবৎ একটি সৎপাত্রী যোগাড় করিতে পারি নাই। অন্ততঃপক্ষে দুইশত পাত্রী দেখিয়াছি, একটিও মনোমত হয় নাই। মনোমত পাত্রী বলিতে কি বুঝি তাহা আপনাকে জানানো দরকার। আমার ছেলেটি লম্বা, উচ্চতায় প্রায় সাড়ে ছয় ফুট। সুতরাং পাত্রীর উচ্চতা ছয় ফুট কিংবা পৌনে ছয় ফুট না হইলে মানাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, পাত্রীর বর্ণ ফিট গৌরবর্ণ হওয়া দরকার। কারণ আমার পুত্রের রং কালো। উভয়ের রং কালো হইলে বংশই কালো হইয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষায় অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই। আপনি লিখিয়াছেন আপনার কন্যা বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছে, বি. এস-সি. হইলেই ভালো হইত। আমার ছেলের সহিত শিক্ষায় তাহা হইলে মিল থাকিত। কিন্তু বি. এ. পাসেও চলিবে। কিন্তু পাস করা চাই। চতুর্থতঃ, জানা দরকার আপনার পিতৃকুলের এবং আপনার শ্বশুরকুলের পুত্র-কন্যার সংখ্যা কিরূপ। যদি কন্যার সংখ্যাই বেশী হয়, তাহা হইলে আমি বিবাহ দিব না। কারণ

তাহা হইলে আপনার কন্যারও বহুকন্যাপ্রসবিনী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে। সে সম্ভাবনার সম্মুখীন হইতে আমি প্রস্তুত নই। আপনি নামজাদা লোক, আপনার বংশপরিচয় যাহা দিয়াছেন তাহাও নিন্দনীয় নয়। এখন উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনার কক্তব্য শুনিলে অন্যান্য কথাবার্তা কহিব। নমস্কারান্তে—

প্রিয় ব্রজেনবাবু,

আপনি যে রতন ব্যানার্জির খোঁজ লইতে বলিয়াছিলেন তাহার খোঁজ লইয়া কোনই হদিস পাইতেছি না। বার্মা শেলের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। বার্মা অয়েল কোম্পানিতেও খোঁজ লইয়াছি, সেখানেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের লিস্টে রতন ব্যানার্জির নাম পাইলাম না। রতন ব্যানার্জির পিতা শৈলেশবাবুর বাড়িও গিয়াছিলাম। বাড়ি তাঁহার নিজের বাড়ি শুনিলাম, কিন্তু কি জঘন্য বাড়ি। একতলা, স্যাঁতসেঁতে। আপনার মেয়ে সে বাড়িতে থাকিতে পারিবে না। শৈলেশবাবু দরিদ্র স্কুলমাস্টার। খুব বিনীত ভদ্রলোক। আমি যাওয়াতে শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখে শুনিলাম যে তাঁহার পুত্র কভেনান্টেড চাকরি পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কোথাও পোস্টেড হয় নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের বাহিরে হইবে। মোটের উপর পাত্রটি হয়তো ভালো, কিন্তু আপনার মেয়ের উপযুক্ত বলিয়া মনে হইল না। আপনি যথাকালে আপনার মেয়ের উপযুক্ত পাত্র ঠিক পাইয়া যাইবেন। বিয়ের ফুল না ফুটিলে তো তাহা হইবে না। ততদিন অপেক্ষা করুন। আমার ভালবাসা সকলে জানিবেন। ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ভালো পাত্রীর সন্ধান পাইব বলিয়া আপনার বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনাকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। আমার মেজ ছেলেটি শিবপুরের B. E. বটে। আপনার মতো প্রতিষ্ঠাবান লোকের সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করা আমার পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার ছেলের বয়স এখনো চব্বিশ পূর্ণ হয় নাই। আপনার কন্যার বয়স লিখিয়াছেন কুড়ি। বয়সের তফাত একটু কম বলিয়া মনে হইতেছে। তাই এ লোভ সংবরণ করিলাম। আপনার কন্যা সৎপাত্রস্থা হউক—ইহাই কামনা করি। আপনার জানাশোনা অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী মেয়ে (ষোল বছরের বেশী নয়) যদি আপনার জানা থাকে জানাইবেন। আমার আন্তরিক প্রীতি ও নমস্কার জানাইতেছি। ইতি—

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার ছেলে এখন বিলাতে। এক বৎসরের আগে ফিরিবে না। ফিরিলেই তাহার বিবাহ দিব। ইতিমধ্যে তাহার জন্য কন্যা বাছিয়া রাখিতেছি। আপনার কন্যার উচ্চতা, বর্ণ, দেহের ও চোখ মুখের গড়ন কেবল জানাইবেন। সম্ভব হইলে একটি ফোটোও পাঠাইবেন। আমাদের যদি পছন্দ হয় আপনাদের সহিত পরে পত্রালাপ করিব। আশা করি ভালো আছেন। নমস্কারান্তে—

মান্যবরেষু,

আপনার পত্র পেয়ে একটু হতাশ হলাম। আমি আপনার পোস্ট বক্সে যখন চিঠি লিখেছিলাম তখন ভাবি নি যে আপনার

মতো স্বনামধন্য ব্যক্তির নাগাল পাব। কিন্তু নাগাল পেয়েও কোনও সুবিধা হ'ল না। আমরা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, তদুপরি আপনার সগোত্র। এ অবস্থায় এ বিষয়ে আর আলোচনার অবসর থাকে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনার প্রস্তাবে আমি গৌরবান্বিত বোধ করছি এবং আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে নিঃসন্দেহে সুখী হতাম। কিন্তু কি করব উপায় নাই। সামাজিক বাধানিষেধ আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, একথা আপনি নিশ্চয়ই বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা করবেন। নমস্কারান্তে—

এই ধরনের অনেক চিঠি আসতে লাগল। কোথাও একটুও আশা বা আশ্বাসের সুর নেই। মরিয়া হ'য়ে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। হরমোহিনীর ঠাকুর প্রায় পঞ্চাশ টাকার সিন্নি খেলেন, হাসলেনও কয়েকবার কিন্তু কৃপা করলেন না। অবশেষে সকলের কলকাতায় যাওয়া স্থির হ'ল। ঠিক হ'ল সেখানেই বসে ব্রজেন্দ্রনাথ কোমর বেঁধে লাগবেন আবার। কলকাতায় সব পাওয়া যায়, পাত্রও পাওয়া যাবে।

তেইশ

অদ্ভুত জায়গা কলকাতা। অনেকদিন পরে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। এত ভিড়, এত অসুবিধা, এত স্থানাভাব কিন্তু এর মধ্যেই একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে লাগলেন তিনি। আর কিছু নয়, এই ভিড়ের মধ্যেও বেশ একটা একাকিত্ব, কেউ কারু হাঁড়ির খবর নেয় না। জনস্রোত চলেছে, কেউ কারও

খবর রাখে না। সবাইয়ের লক্ষ্য নিজের স্বার্থের উপর নিবদ্ধ। ঘাড় ফিরিয়ে অপরের দিকে চাইবারও অবসর নেই কারও। এর মধ্যেই নরেন আরও দুটি সম্বন্ধ এনেছিল। একটি ইন্‌জিনিয়ার, উপাধি চক্রবর্তী। হরমোহিনী রাজী হলেন না। দ্বিজেনবাবুর সংসার স্বচক্ষে দেখেও তাঁর মত বদলায় নি।

দ্বিতীয় পাত্রটি গাঙ্গুলী। ছেলেটি মন্দ ছিল না, কিন্তু কোষ্ঠী মিলল না। তার সপ্তমে রাহু শনি এবং রবি দেখে ব্রজেন্দ্রনাথের জ্যোতিষীই এখানে বিয়ে দিতে বারণ করলেন।

বরেন একটি প্রফেসার ছেলের কথাও বলছিল, কিন্তু প্রফেসার পাত্রও হরমোহিনীর পছন্দ নয়।

হরেন একটি এয়ার-পাইলট পাত্র এনেছিল। কিন্তু তখন উপর্যুপরি কয়েকটি এরোপ্লেন দুর্ঘটনার কথা কাগজে বেরিয়েছে, সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দুজনেই পেছিয়ে গেলেন। হরমোহিনী বললেন, 'মানুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব। ওরা কি মানুষ, ওরা পাখী।' হরমোহিনী সমানে জেদ ধরে বসে রইলেন কলিকাতা নিবাসী 'বন্দ্যোপাধ্যায়' উপাধিধারী সৎপাত্র না পেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

সুতরাং অবস্থা আগে যেমন জটিল ছিল, কলকাতায় এসেও ঠিক তেমনি রইল। জট এতটুকু খুলল না। মাঝে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের একজন পরিচিত সাধু এসেছিলেন। কানু ছাড়া যেমন গান নেই, তেমনি মেয়ের বিয়ের কথা ছাড়া ব্রজেন্দ্রবাবুর মুখে আজকাল অন্য কথা নেই। তিনি কথায় কথায় মহারাজকে বললেন, "আজকাল মেয়েদের বিয়ে দেওয়া ঘোরতর সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মেয়েটির জন্য পাত্র খুঁজে খুঁজে হয়রান হ'য়ে গেলুম। আর পেরে উঠছি না। ভাবছি বি. এ. পাশ করলে ওকে এম. এ. ক্লাসে

ভরন্তি করে দিয়ে যাব। তারপর যা হয় হবে। যা হবে তাও দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কোনও বয়-ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত। যুগের এই হাওয়া আজকাল—”

স্বামীজী বললেন, “এ যুগের হাওয়ায় সবাই গা ভাসিয়ে দিলে সমাজ উচ্ছন্ন যাবে। আজকালকার ধনী সমাজ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অত্যধিক পয়সা থাকার জন্য। গরীব সমাজও উচ্ছন্ন যাচ্ছে দারিদ্র্যের জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের কিছুটা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে প্রাচীন প্রথা। তারাই একমাত্র তাদের মধ্যেই আমাদের সমাজের সুন্দর আদর্শটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তারাই এখনও কন্যাকে সযত্নে লালন-পালন করে সৎপাত্রে সম্প্রদান করে। তারাই এখনও বাবা মায়ের শ্রাদ্ধ করে, তারাই দশবিধ সংস্কারের ধারক। বাকী সব বেজাত হ'য়ে গেছে, জাতের বৈশিষ্ট্য, কৌলীন্য সব হারিয়ে সাহেবদের নকল করে হাস্যকর হয়েছে। চতুর্দিকেই বর্ণসঙ্কর। বিবেকানন্দ আমাদের দেশের সনাতন বিবাহ পদ্ধতিকে সমর্থন করতেন। বলতেন, একমাত্র পিতা-মাতাই কন্যার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পাত্র নির্বাচন করতে পারে, আর কেউ পারে না। কন্যা মোহে অন্ধ হ'য়ে অনেক সময় বিপথগামিনী হয়। আজকাল সুবিধাবাদীদের যুগ। সুবিধা হবে বলে' কাপড় ছেড়ে ঝোলা পায়জামা পরে ‘সবাই’, সুবিধা হবে বলে যেখানে সেখানে হোটেলে খায়, সুবিধা হবে বলে চাকুরে মেয়ে বিয়ে করে, সুবিধা হবে বলে যে-কোনও দুরাত্মার পায়ে প্রণত হ'তে তাদের আপত্তি নেই। মাত্র কয়েকটি মধ্যবিত্ত পরিবার এখনও এই হাস্যকর অনাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আগলে আছে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকার। মনে রাখবেন আপনি তাদের মধ্যে একটি। যে আধুনিকতা অসংযমের নামান্তর আপনিও তাতে গা ভাসিয়ে দেবেন না। খবরদার না!”

হরমোহিনী মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিলেন। মহারাজের বক্তৃতা শেষ হতেই প্রণাম করলেন তাঁকে। তারপর বললেন, "আপনি আমার মনের কথাটি বলেছেন মহারাজ। এরা মেয়েকে যেখানে সেখানে বিয়ে দিতে চায়, মেয়েকে চাকরি করতে বলে—একমাত্র আমিই রুখে দাঁড়িয়েছি বলে পারে নি।"

"মেয়েরাই তো যুগে যুগে ধর্মের রক্ষক মা।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে। কোথাও যে মনোমত পাত্র পাচ্ছি না।"

"পাবেন পাবেন"—আশ্বাস দিলেন মহারাজ—"যখন সময় হবে পেয়ে যাবেন। যেখানে ভবিতব্য সেখানেই হবে। আপনি বৃথাই ভেবে মরছেন—ইংরেজিতে একটা কথা আছে, marriages are made in Heaven. মর্ত্যের ওতে কোন হাত নেই।"

মহারাজ চলে' গেলেন।

সেই দিনই রাত্রি সাড়ে দশটার সময় দুয়ারের কড়া নড়ল। ব্রজেন্দ্রনাথই তাড়াতাড়ি উঠে কপাট খুলে দিলেন। দেখেন এক সৌম্যদর্শন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথার চুলে যদিও পাক ধরেছে, কিন্তু মুখে চোখে যৌবনের ছটা। নমস্কার করে বললেন, "আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো।"

এক মুখ হেসে বললেন, "আমাকে চেনবার কথা নয়। এই চিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন।"

একটি চিঠি দিলেন। কুসুমিকা কিছুদিন আগে যে ইন্‌জিনিয়ার পাত্রটির খবর দিয়েছিল তার বাবাকে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি চিঠি লিখেছিলেন কলকাতায় আসার আগে। দেখলেন ভদ্রলোক সেই চিঠিখানি এনেছেন।

"ও। আপনিই কি ভূপেশবাবু?"

"হ্যাঁ আমিই।"

"আসুন আসুন আসুন। এত রাত্রে আপনি কষ্ট করে এলেন কেন! এক লাইন লিখে জানালে আমিই যেতুম আপনার কাছে—"

"তাতে কি হয়েছে"—এক মুখ হেসে বললেন ভূপেশবাবু—"বিয়ে তো ভবিতব্যের হাতে, যদি হবার হয় হ'য়ে যাবে। ভাবলাম বিয়ে হোক আর না-ই হোক, একজন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ তো করে আসি—"

হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসিতে শিশুর সারল্য।

"উষা—উষা—"

উষা পাশের ঘরেই ছিল। এসে দাঁড়াল।

"এইটেই আমার মেয়ে, প্রণাম কর—"

উষা প্রণাম করল।

"বাঃ—"

এরপর আর কিছুতেই আটকাল না। অতিশয় সহজভাবে সব হ'য়ে গেল। ভূপেশবাবু কোষ্ঠী পর্যন্ত চাইলেন না। বললেন, "অদৃষ্টকে দেখা যায় না। দেখবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। ভগবান যা করবেন তা-ই হবে।"

ব্রজেন্দ্রবাবু সসংকোচে একবার দেনা-পাওনার কথা তুলেছিলেন। ভূপেশবাবু হেসে বললেন, "দেনা-পাওনা ক্যানসেল্‌স্ ইচ্ আদার (cancels each other). তবে বরপণ আপনাকে দিতে হবে। যে পণ আমার বাবা নিয়েছেন, আমি নিয়েছি, আমার বড় ছেলে নিয়েছে সে পণ আপনাকেও দিতে হবে। নগদ একটি টাকা—"

হো হো করে হেসে উঠলেন নিজের রসিকতায় নিজেই। তার

পরদিন এসে বললেন—"ও মশাই, যে বরপণ দাবি করেছিলুম তা-ও আর আদায় করতে পারব না। কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, ডাউরি বিল পাস হয়ে গেছে!"— আবার সেই হো হো হাসি।

ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনী দু'জনেই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। এমনটা যে এ যুগে সম্ভব তা তাঁরা ভাবতে পারেন নি।

চব্বিশ

নির্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে বিবাহ হ'য়ে গেল। বিয়ের দিন ভিড়ে গোলমালে ব্যস্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। সেদিন তিনি বুঝতে পারেন নি উষা চলে গেলে তাঁর কি অবস্থা হবে। কিন্তু যখন উষা সিঁথের সিঁদুরে দশদিক আলো করে হাসিমুখে চলে গেল সেদিন তিনি যেন অন্ধকার দেখলেন চোখে। মনে হ'ল একা থাকব কি করে। ঠিক ওই সময়ে আবার দুয়ারে কড়া নড়ল। একাই বসেছিলেন তিনি। উঠে কপাট খুলে দিলেন। কপাট খুলেই ভূত দেখলেন যেন।

"এ কি কুসি? তুই! এ কি তোর চেহারা—"

কুসুমের চেহারা জরাজীর্ণ, চক্ষু কোটরগত, চোখের কোলে কালি। দাঁতগুলো বড্ড বেশী বড় দেখাচ্ছে। মাথার সামনে চুল উঠে গেছে। চুলে তেল নেই। গালের হাড় দুটো উঁচু।

"হ্যাঁ, চেহারাটা বড্ড খারাপ হ'য়ে গেছে। গত দু'মাস থেকে রোজ জ্বর হচ্ছিল। কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। তাই বাবা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—"

"ও। আচ্ছা বোস। কিছু খেয়েছিস? নরেন বেরিয়ে গেছে। সে এলে সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভয় কি। ভাল হয়ে যাবি—"

"উষার বিয়ের চিঠি আমরা পেয়েছিলুম। বাবা ভূপেশবাবুকে চিনতেন। তিনিও একটা চিঠি লিখেছিলেন তাঁকে। ছেলেটি খুব সুন্দর, নয় ?"

"হ্যাঁ—"

"আমার শরীর খারাপ বলে আর তো আসতে পারি নি। কিন্তু কাল মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে চলে এলুম।"

"বেশ করেছিস। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ব্রজেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গলার স্বর কেঁপে

পঁচিশ

কুসুমিকার যক্ষ্মাই হয়েছিল। নরেন তাকে একটা ভালো স্যানাটোরিয়মে পাঠিয়ে দিলে। ডাক্তাররা আশা দিলেন ভালো হ'য়ে যাবে। স্যানাটোরিয়মের খরচ ব্রজেন্দ্রনাথ দেবেন বললেন।

যাবার আগে কুসুমিকা ম্লান হেসে বলল, "কাকাবাবু, আমার স্কুলটার কি হবে। আমি অনেক জায়গায় ঘুরে দেখলুম, কম মাইনেতে কোন ভাল টিচাব আসতে চায় না। আমি তো বিনা মাইনেতে কাজ করতুম। আমি চলে গেলে স্কুলেব ইংরিজি পড়াবে কে ?"

"আমি পড়াব—"

বলে উঠলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। বলে হঠাৎ যেন তৃপ্তি পেলেন।

কুসুমিকা মাদ্রাজে চলে যাওয়ার পরদিনই ব্রজেন্দ্রনাথ হরমোহিনীকে বললেন, "তুমি ছেলেদেব কাছে থাক। আমি দেবেনের কাছে যাচ্ছি—ওর স্কুলে পড়াব।"

"তুমি এই বয়সে পারবে ওই পাড়াগাঁয়ে থাকতে?"

"পারব, পারতেই হবে। ওইটুকু কচি মেয়ে যা পেরেছে তা আমি পারব না—"

কারও কথা শুনলেন না, পরদিনই চলে গেলেন।

দিন পনরো পরে হরমোহিনীও সেখানে গিয়ে হাজির। বিস্মিত দেবেনবাবু বললেন, "একি বউদিদি, আপনি চলে এলেন যে!"

হরমোহিনী হেসে উত্তর দিলেন—"এলুম। ঝগড়া করতে না পেরে গলা কুটকুট করছে।"

"কি কাণ্ড!"